১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ■ দাম : ২৫ টাকা ■ পৃঃ ১

অ্যালার্জি থেকে প্রাণসংশয়

সুস্বাস্থ্য

- কোলেস্টেরলের বিপদ
- সুগারের ঝুঁকি কাদের বেশি
- নিপা ভাইরাসের আতঙ্ক
- কন্যাভ্রূণ হত্যা
- কীভাবে ক্যারিয়ার রক্ষা
- নোবেলজয়ীদের কথা

*জনস্বার্থে সচেতনতা বৃদ্ধিতে মোমেন্টাম অর্থোপেডিক কর্তৃক প্রচারিত।

হাঁটু বা হিপ জয়েন্টে ব্যথার স্থায়ী সমাধান

অসহ্য হাঁটু বা হিপ জয়েন্টের ব্যথায় যদি স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হতে বসে ও ব্যথার কারণ যদি হয় অস্টিওআর্থ্রাইটিস তবে বিকল্প চিকিৎসা না খুঁজে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করিয়ে নেওয়াই ভালো। কারণ অস্টিওআর্থ্রাইটিসের হাঁটু বা হিপ জয়েন্টের ব্যথা থেকে মুক্তির একমাত্র স্থায়ী সমাধান জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট। এর কোন শর্টকাট বা বিকল্প চিকিৎসা নেই। তাই অযথা ব্যথায় কষ্ট না পেয়ে প্রয়োজনে নি বা হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করিয়ে নিন আর সার্জারিটা রোবোটিক হলে দ্রুত সেরে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন– ভরসা দিলেন পনের হাজারেরও বেশী হাঁটু প্রতিস্থাপনের রূপকার বেলভিউ ক্লিনিক, কলকাতার রিপ্লেসমেন্ট বিভাগের ডাইরেক্টর, অর্থোপেডিক ও রিপ্লেসমেন্ট সার্জন **ডা. সন্তোষকুমার**।

DR. SANTOSH KUMAR
Consultant Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon
Belle Vue Clinic, Kolkata

প্রশ্ন : অস্টিওআর্থ্রাইটিস কি হাঁটু বা হিপ জয়েন্টের ব্যথার অসুখ?

ডা. সন্তোষকুমার : অস্টিওআর্থ্রাইটিস একটি হাড়ের ক্ষয়জনিত অসুখ। যে কোন বোন জয়েন্টেই এটি হওয়ার ফলে ব্যথা হতে পারে তবে হাঁটু বা হিপ জয়েন্টে হলে চলাফেরায় অসুবিধা হয়। হাড় ক্ষয়ে গিয়ে নার্ভ রুটে চাপ দেওয়ার কারনে অসহ্য ব্যথা হলে হাঁটু বা হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপনই হয়ে ওঠে একমাত্র স্থায়ী সমাধান। কারণ এই ক্ষয় কোনভাবেই পূরন হয় না। আবারআর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিংবা কন্ডোম্যালেশিয়া প্যাটেলার মতো অসুখও পরবর্তিকালে অস্টিওআর্থ্রাইটিসে রূপান্তরিত হতে পারে।

প্রশ্ন : হাঁটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস বোঝা যায় কি করে?

ডা. সন্তোষকুমার : সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আধ ঘণ্টার উপরে হাঁটু ব্যথায় শক্ত হয়ে থাকলে, সিঁড়ি দিয়ে উঠলে হাঁটুতে ব্যথা হলে, শুয়ে থাকলেও হাঁটু ব্যথা করলে, হাঁটুর ব্যথায় ঘুম না আসলে বা ঘুম ভেঙ্গে গেলে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে। এরপর আপনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি আপনার হাঁটু বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন, আপনার হাঁটার ধরণও আপনি কতটা হাঁটু ভাঁজ করতে পারছেন, দেখা হবে। এর পরে ডাক্তারবাবু প্রয়োজনে এক্সরে দেখে হাটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।

প্রশ্ন : হাঁটু প্রতিস্থাপনের ঠিক কত দিন আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া উচিৎ?

ডা. সন্তোষকুমার : সাধারণত সাত থেকে দশ দিন হাতে সময় রেখে সার্জারির দিন স্থির করা হয়। এই সময়ের মধ্যে রোগীকে কিছু প্রয়োজনীয় ব্লাড ও ইউরিন টেস্ট এবং একটি সামগ্রিক মেডিকেল চেকআপের পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলগুলি রোগীর শরীর অপারেশন ও অ্যানাস্থেশিয়ার উপযুক্ত কিনা এবং শরীরে কোন সক্রিয় সংক্রমন আছে কিনা জানতে সাহায্য করে। পেশেন্টের হাই ব্লাড প্রেসার বা বা ব্লাড সুগার থাকলে অপারেশনের আগে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, নিয়ন্ত্রণ করতে হয় হার্টের অসুখও। রোগী নিয়মিত কোন ওষুধ খেলে সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ সার্জনকে জানান অত্যন্ত জরুরী। কারন ব্লাড থিনারের মতো কয়েক ধরণের ওষুধ সার্জারির নির্দিষ্ট দিন আগে থেকে বন্ধ করা উচিৎ। তবে দাঁত, ত্বক বা প্রস্রাবের কোন সংক্রমণ বা অসুখ নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

প্রশ্ন : নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের জন্য সাধারণত কিভাবে প্রস্থেসিস নির্বাচন করা হয়?

ডা. সন্তোষকুমার : বাজারে বিভিন্ন ধরণের নি জয়েন্ট প্রস্থেসিস বা কৃত্তিম হাঁটু পাওয়া যায়। এর মধ্যে সাধারণ কাজকর্ম করা, চলাফেরা, সিঁড়িভাঙ্গা, গাড়ি চালান বা রিক্সা, অটো থেকে নামার জন্য ১২০ ডিগ্রী ঘোরার মতো নি ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। তবে হাঁটুকে সম্পূর্ণ মুড়তে চাইলে বা বাবু হয়ে বসতে চাইলে 'রোটেটিং প্ল্যাটফর্ম হাই ফ্লেক্সেশন নি' ব্যবহার করতে পারেন। তবে এই ধরণের প্রস্থেসিস ব্যবহারের কিছু প্রাথমিক শর্ত থাকে।

প্রশ্ন : রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের সুবিধা কি?

ডা. সন্তোষকুমার : রোবটের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স মুহূর্তের মধ্যে মিলিমিটারের কয়েক সহস্রাংশ পর্যন্ত হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে প্রস্থেসিসের ফিটিংস সাধারন কম্পিউটারাইজড সার্জারির থেকে বহু গুণ বেশী নিঁখুত হয়। আবার একইভাবে হাড় ও সফট টিস্যুও অত্যন্ত অল্প পরিমাণে সুক্ষ ও সঠিকভাবে কাটা হয় বলে রক্তপাত প্রায় হয় না বললেই চলে, ফলে পোস্ট অপারেটিভ পেনও কমে যায়, রোগী দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। অন্য দিকে অনেক বেশী পর্যবেক্ষণ করতে পারে বলে প্রস্থেসিসের অ্যালাইনমেন্ট সাধারণ সার্জারির থেকে একশ শতাংশ সঠিক হয় তাই প্রস্থেসিসের আয়ুও বাড়ে।

প্রশ্ন : জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পরে সত্যিই কি আগের মতো সব কাজ করা যায়?

ডা. সন্তোষকুমার : হ্যাঁ। আপনার শরীর ঠিক থাকলে ও পেশী সবল থাকলে আপনি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের পর সিঁড়িতে ওঠানামা, মর্নিংওয়াক, বাজার করা, বাসে যাতায়াত, গাড়ি চালান থেকে পাহাড় বেড়াতে যাওয়ার মতো সব কাজই খুব ভালভাবে আর সহজে করতে পারবেন। তবে পোস্ট অপারেটিভ নিয়মকানুন আপনাকে মেনে চলতে হবে। সার্জারিটা রোবোটিক হলে আপনার কাজকর্ম আরো অনায়াস ও সাবলিল হয়ে উঠবে। সত্যই আপনার জীবনটা আবার আনন্দমুখর হয়ে বদলে যাবে। তাই ব্যথার কষ্টে জীবন শেষ না করে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নিন। সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন।

হেল্পলাইন : 9831266632/9831911584
e-mail : santdr@gmail.com
www.mykneemylife.org
Whatsapp 9831911584
DR. SANTOSH KUMAR KNEE FOUNDATION
My Knee, My Life
Plot 332, Lake Town Block A, Kolkata-89
Near Lake Town PS.
DR. SANTOSH KUMAR
Belle Vue Clinic, Room No. 5, Doctors' Chamber, 9 Loudon Street, Kolkata-17

SUNNY'S
ADVITAMIN
77 YEARS
1948-2025
ANNIVERSARY
সব ঋতুতে,
সব বয়সের
সমান উপযোগী
পুরো পরিবারের
সুরক্ষায় সেরা
টাই বেছে নিন
With
OLIVE OIL
FOR GROWTH AND VIGOUR OF BABIES
SUNNY'S
Natural
AD®
VITAMIN
BABY OIL
CONTAINS: NATURAL VITAMIN A, D & E AND OLIVE OIL
MANUFACTURED BY:
SUNNY INDUSTRIES (PVT) LIMITED
ORIGINAL PRODUCT
100%
ORIGINAL
ভালোলাগার
এক অনন্য অনুভূতি
কোনো খনিজ তেল নেই
LIGHT LIQUID PARAFFIN
SUNNY INDUSTRIES
PRIVATE LIMITED
Kolkata - 700 025
CONTAINS
NATURAL
VITAMIN A D & E
AND OLIVE OIL
orionad@gmail.com

A.H IVF & INFERTILITY RESEARCH CENTRE

Life begins here.....

Dr. Jayashree Bhattacharya
MBBS, MRCOG, FRCOG(LOND)
Consultant Gynaecologist & IVF Specialist

40+ years of experience in IVF & Gynaecology field

we offer:

- ☆IVF
- ☆IUI
- ☆ICSI
- ☆Embryo Freezing
- ☆Semen Freezing
- ☆Male Infertility
- ☆Laparoscopy
- ☆Genetic screening
- ☆Hormone Assay
- ☆Antenatal care
- ☆Paediatric ward

SPECIAL OFFER
IVF @ 59,999/-*

** Terms & conditions apply*

Call now at: 8240114296/9674598494/8240430996

www.drjbhattacharya.com

Centres : KOLKATA | RANCHI | PATNA | SILIGURI | DURGAPUR

সুস্বাস্থ্য

৩২ বর্ষ • ৭ সংখ্যা
১ ফেব্রুয়ারি • ২০২৬

SUSWASTHA
32nd Year ▫ 7th Issue
1st FEBRUARY ▫ 2026

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :
ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র রায়
সম্পাদক : **দেবব্রত কর**
সহযোগী সম্পাদক : **কাঞ্চন সানা**
সম্পাদকীয় বিভাগ : **সামাদ মল্লিক**

বিজ্ঞাপন বিভাগ :
সুদীপ্তা দাস ৯৮৩০২০১৭৫১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : **অমিত চট্টোপাধ্যায়**

মুখ্য পরিবেশক : **রবি সাহা**
ফোন : ২২৪৩-৮১১৩
মো : ৯৮৩০৩-৮৯৩৪২

বিপণন সহযোগী (বাংলাদেশ) :
আমির অ্যান্ড সন্স
৫৯/৩/১ পুরনো পল্টন,
ঢাকা-১০০০ (সুরমা টাওয়ারে পিছন)
দূরভাষ : ৮৮০-১৭১১১৩৭৮৫১

••

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক : দেবব্রত কর ২এ, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স, 'জয়জয়ন্তী', কলকাতা-১৯ ফোন : ৯৮৩০০৬৭৩২৯ হইতে প্রকাশিত।
ই-মেল : suswastha9@gmail.com
Please Visit : www.suswastha.com
এবং দে'জ অফসেট,৩/২ মঠেশ্বরতলা রোড, কলকাতা-৪৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

দাম ২৫ টাকা

[বিভিন্ন লেখায় যে-সমস্ত মডেলের ছবি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট রোগে আক্রান্ত নন। স্রেফ লেখার প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি : সৌজন্যে নেট পরিষেবা
তিন মাসের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে ধরে নিতে হবে লেখাটি অমনোনীত হয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না, কপি রেখে পাঠান।]

বিমান মাশুল ত্রিপুরায় ১ টাকা।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যত্র ১.৫০ টাকা।

নিবেদন

'সুস্বাস্থ্য'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিতে অসুস্থতা ও তার নিরাময় সম্পর্কিত পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্রের বক্তব্য সংশ্লিষ্ট লেখক বা চিকিৎসকের। দায়িত্ব পত্রিকার নয়। চিকিৎসা করান আপনার নিজস্ব চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার। দায়িত্ব পত্রিকার নয়।

সম্পাদক, সুস্বাস্থ্য

অ্যালার্জি হেলাফেলার নয়। সতর্ক না হলেই বিপদ। এমনকী মৃত্যুও হতে পারে। তাই সাবধানে থাকুন, কখন বাড়াবাড়ি হতে পারে জেনে রাখুন। সচেতন করতেই অ্যালার্জির একগুচ্ছ লেখা নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ।

সূচিপত্র

• সম্পাদকীয়	...	৫
• অ্যালার্জির সাতকাহন	... ডাঃ প্রমিতশ্রী ভট্টাচার্য	৭
• অ্যালার্জির বাড়াবাড়ি	... ডাঃ নীলাদ্রি সরকার	৯
• অ্যালার্জিক অ্যাজমা	... ডাঃ এস. কে. গুপ্ত	১১
• অ্যালার্জির নানা রূপ	... ডাঃ বিকাশ মন্ডল	১৩
• ঘরোয়া দাওয়াই	... ডাঃ সুকুমার দাস	১৫
• আংশিক নাকি সম্পূর্ণ হাঁটু বদল	... ডাঃ ইন্দ্রনীল পাল	১৭
• কোলেস্টেরলের বিপদ	... ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস	১৯
• ওজন বাড়লেই সুগারের ঝুঁকি	... ডাঃ অমিতাভ সুর	২২
• বয়স্কদের নিউমোনিয়া	... ডাঃ অংশুমান মুখার্জি	২৫
• রজঃনিবৃত্তির পর হরমোন চিকিৎসা	... ডাঃ সবুজ সেনগুপ্ত	২৭
• কীভাবে আপনার ক্যারিয়ার রক্ষা	... ডাঃ অঞ্জন ভট্টাচার্য	২৯
• শাসনকে শাসন করা	... ডাঃ অমরনাথ মল্লিক	৩১
• বাবা-মা'র প্রতি টান কম	... ডঃ শম্পা ঘোষ	৩৪
• ওষুধ ছাড়াই মানুষ বাঁচে	... ঈশানী মল্লিক	৩৬
• কন্যা ভ্রূণ হত্যা	... পৌলমী ভট্টাচার্য	৩৯
• রক্তদানের নানা কথা	... ডাঃ শ্যামসুল হক	৪২
• নিপা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক	... অন্বেষা গাঙ্গুলী	৪৪
• শীতে ত্বকের সমস্যা	... ডাঃ শান্তনু গাঙ্গুলী	৪৬
• কোন খাবার কতটা খাবেন	... কমলা আদক	৪৮
• ফুলের ওষুধি গুণ	... ডঃ রমলা মুখার্জি	৫১
• স্পোর্টস ইঞ্জুরিতে আকুপাংচার	... ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত	৫৪
• ২০২৫ : চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল	... ডঃ শৌর্যেন্দ্রনাথ সরকার	৫৫
• মওলিলংএশিয়ার স্বচ্ছতম গ্রাম	... সৌমেন্দ্র নাথ দাস	৫৮
• সুস্বাস্থ্যের রান্না	... ভারতী কুন্ডু	৫৯
• সংক্ষেপে	...	৬১
• মানসিক প্রশ্নোত্তর	... পার্থ প্রতিম রায়	৬৫

দোষে-গুণে গড়া মানুষ। তবে সবটাই জন্মগত নয়। এমনকী জন্মগত দোষ-গুণও বদলে দেওয়া যায় বিজ্ঞানের হাত ধরে। যা আপনার ক্যারিয়ারে আনতে পারে ব্যাপক পরিবর্তন। লিখেছেন বিশিষ্ট শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অঞ্জন ভট্টাচার্য।

সুস্বাস্থ্য

আমাদের ইন্টারনেট অনুসন্ধান করুন

onlinesuswastha.com

আমাদের ইন্টারনেট অনুসন্ধান করুন

onlinesuswastha.com

আমাদের ইন্টারনেট অনুসন্ধান করুন

onlinesuswastha.com

সুস্বাস্থ্য

নো অ্যালার্জি

অ্যালার্জির প্রতি মানুষের কেন যে এত অ্যালার্জি, সেটা এখনো খোলসা করে বলতে পারেনি চিকিৎসা বিজ্ঞানও। একটু আধটু র‍্যাশ, চুলকানির বেশি ভাবতেই চান না সাধারণ মানুষ। খুব বেশি হলে দোকান থেকে ওষুধ কিনে খাওয়া। অথচ বড় করে না ভাবতে চাইলেও সাধারণ অ্যালার্জিও বেশ ভয়ংকর। আর অবহেলায় হতে পারে হন্তারক। কিন্তু সচেতনতার অভাবে চারপাশে অ্যালার্জেন নিয়ে আমাদের বসবাস। আর বছরভর রোগজ্বালায় জর্জরিত থাকা। কীভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে, তারই সুলুকসন্ধান এই সংখ্যায়। আশাকরি কাজে লাগবে।

সুস্বাস্থ্যের ছড়া

আদা জল

ত্রিপর্ণা চট্টোপাধ্যায়

রাতে যদি বার বার
বহু মূত্র হয়,
দূর হবে রোগ
যদি আদা সঙ্গে রয়।

সন্ধ্যায় গরম জল
আর অল্প আদা,
খেতে হবে দিন কয়েক
নেই কোনো বাধা।

বয়স বাড়ে বাড়ুক
ভয় নেই তাতে,
আদা জল সমাধান
সব সমস্যাতে।

তরকারিতে আদা যেমন
বাড়ায় তার স্বাদ,
বহু মূত্রেও কার্যকরী
আনন্দ সংবাদ।

তাই বলি আদা জল
খাবেন প্রয়োজনে,
ডাক্তারবাবুরা চিকিৎসায়
বলেছেন সে কারণে।

উপকারি কুলেখাড়া

হিমাংশু আদক

ফিসচুলাতে কাজ দেয় খুব
শক্তি পেশির বাড়ায়,
আমাশয়েও দেয় উপকার
বাতের ব্যথাও তাড়ায়।

পৌরুষত্ব বৃদ্ধিতে কাজ
পেটের অসুখ সারায়,
মূত্রনালির প্রশমন আর
হিমোগ্লোবিন বাড়ায়।

জয়েন্ট ব্যথা কমিয়ে দিতে
হয় প্রয়োজন এটার,
কুলেখাড়ার নানান পদে
পাত সাজানোই বেটার।

সুখের নিদ্রা

তপন কুমার বৈরাগ্য

রাতেরবেলায় সুখের নিদ্রা
যার চোখেতে আসে,
চিরসুখী হয়ে সে জন
ভরায় ফুলের বাসে।

ঘুমটা ওরে ভালো হলে
শরীর থাকে ভালো,
কর্মযুদ্ধে উৎসাহ পায়
জ্বলে মনের আলো।

ঘুমের মতন সুখপ্রদ
হয় না কিছু ভবে,
ঘুমের সাথে বাড়ে আয়ু
কীর্তি মহান হবে।

নিদ্রা হল সুখের আধার
এই ভুবনের পরে,
মস্তিষ্কটা সুস্থ থাকে
সব মানুষের তরে।

লেসিথিন

শ্যামল কুমার চক্রবর্তী

নার্ভ আর ব্রেন টিস্যু
গঠন করে লেসিথিন,
এই উপাদানের অভাবে
শরীর ভাঙে দিন-দিন।

লেসিথিনের অভাব হলে
ধরে মনোরোগ,
ভেঙে পড়ে নার্ভাস সিস্টেম
মেলে দুর্ভোগ।

হার্ট কাজ করে সঠিক ছন্দে
শরীরে থাকলে লেসিথিন,
পুষ্টি পেয়ে হার্ট থাকে সজীব
হয় না শক্তিহীন।

লেসিথিন থাকে গমের বীজে
ডিম আর সোয়াবিনে,
এসব খাবার খেতে হয়
লেসিথিনের অভাব পূরণে।

বেগুনের গুণ

দিলীপ কুমার পাত্র

আনাজগুলোর মধ্যে আছে
বেগুনের ওই দানও,
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে
বাজার থেকে আনো।

মস্তিষ্কটা ভালো রাখে
রাখে ভালো ত্বকও,
কত ভাবে খাবে তুমি
করো একটা ছকও।

বেগুনের ওই জানতে যে গুণ
দাও তো বইয়ে উঁকি,
হৃদরোগেরও কমায় যে সে
আজকে অনেক ঝুঁকি।

স্বাস্থ্য শরীর সুস্থ রেখে

প্রদীপ্ত সামন্ত

স্বাস্থ্য শরীর সুস্থ রেখে
এগিয়ে তোমায় যেতে হবে,
ফ্রি হ্যান্ড ও যোগব্যায়ামে
নিয়ত নিরত ব্যস্ত রবে।

সকালে উঠেই প্রাতঃক্রিয়া
চোখ হাত মুখ প্রক্ষালনে,
দেহ মনে আসবে সতেজ
ভোরের বাতাস অক্সিজেনে।

এরপরেতে ধ্যান প্রাণায়াম
স্মরণ কর পরম পিতায়,
চলতে শেখার বাণী যাঁহার
বেদ বাইবেল কোরান গীতায়।

জীবন শুরু চিৎ রূপেন
জ্ঞান আহরণ পড়াশোনায়,
কর্মযোগের শিক্ষা পাঠে
শরীর স্বাস্থ্য খেলাধুলায়।

রোগ, ভোগ ও যোগেই তফাৎ
কার জীবনটা চলবে কেমন?
শুদ্ধাচারের নিষ্ঠাব্রতে
ধনুক ভাঙা করবে যে পণ।

হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, নাক বন্ধ থাকা, নাক চুলকানো, এছাড়া শ্বাস নিতে কষ্ট এগুলো মূলত অ্যালার্জিজনিত অ্যাজমার লক্ষণ। যখন অ্যালার্জি জনিত কারণে অ্যাজমা হয় তখন বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই আওয়াজ এবং শ্বাসকষ্ট হয়।

অ্যালার্জির সাতকাহন

ডাঃ প্রমিতশ্রী ভট্টাচার্য
(বিশিষ্ট অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ, স্পাইনাল ডায়াগনোস্টিক)
মোবাইল : ৯১৬৩৮১২৮২

শীতের সময় মানে খেলা-মেলা, আনন্দ-উৎসবের সময়। আনন্দের ভাগ নিতে সপরিবারে মেলায় গেলেন, ঘুরলেন, খাওয়া-দাওয়া করলেন। সব কিছু ঠিক ছিল কিন্তু বেঠিক যে জিনিসটা, তা হল আপনার অজান্তে মানুষের পায়ের ঘর্ষণে ওড়া ধুলো আপনার শ্বাসনালী দিয়ে ঢুকতে শুরু করল। অথবা বাড়িতেই ধোঁয়া ওঠা মুসুরডাল সঙ্গে গরম বেগুনি দিয়ে খেলে, খওয়াটা জমে যাবে ভেবে খেলেন। যাইহোক মেলা থেকে বাড়িতে ফিরতে না ফিরতেই খুসখুসে কাশি বা খেয়ে উঠে একটু বসার পরে সারা গায়ে চুলকানি শুরু হয়ে গেল। এটা কিন্তু গল্প নয় বরং এমনটা সামেশাই ঘটে থাকে। আর এটাকে অগ্রাহ্য করে মানুষ কিছু ওষুধের দোকানের ওষুধ খেয়ে নিয়ে ভেবে থাকেন ঝামেলা মিটে গেল, এমনটা করলে ভুল হবে। বরং ঝামেলা বাধে শরীরের ইমিউন সিস্টেমে বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায়। এর ফল যেমন সদূরপ্রসারী তেমনই ভয় ধরানো। এটা অ্যালার্জি। অবহেলা করলেই বিপদ।

অ্যালার্জি কী

অ্যালার্জি হল আমাদের শরীরের রোগ, প্রতিরোধ ক্ষমতার এক অতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া সেইসব জিনিসে হয় যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকারক নয়। এগুলোকে অ্যালার্জেন বলা হয়। যেমন পোলেন (পরাগরেণু), খাবারদাবার, ধুলোকণা বা ডাস্ট মাইট ইত্যাদি। যাদের শরীর বেশি সংবেদনশীল তাদের শরীর ওই পদার্থগুলোকে ক্ষতিকর ভেবে স্বাভাবিকের থেকে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায়। এই

প্রতিক্রিয়া যদি অল্প হয় তাহলে তার উপসর্গ হল হাঁচি, কাশি, গা চুলকানি ইত্যাদি এবং যদি সেটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যায় তাহলে সেটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অ্যানাফাইল্যাক্সিস প্রতিক্রিয়া।

অ্যালার্জি কীভাবে হয়

আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আই.জি.ই অ্যান্টিবডি তৈরি করে মাস্ট সেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। এগুলোর থেকে হিস্টামিন নামক একটি জৈব নাইট্রোজেনাস যৌগ বের হয়। বারবার শরীর যখন একই অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে আসে তখন হিস্টামিন বের হতে থাকে। এটাই অ্যালার্জির কারণ।

অ্যালার্জেন কী

অ্যালার্জেন হল যে বিষয়গুলো অ্যালার্জি সৃষ্টি করে সেগুলো যেমন পরাগরেণু, গৃহপালিত পোষ্যদের লোম, ডাস্ট মাইট, পোকামাকড়ের বিষ, কিছু খাবার-দাবার, কিছু ওষুধপত্র, ছত্রাক, ঘুণ পোকা ইত্যাদি।

উপসর্গ

উপসর্গ দু'ধরনের হতে পারে—

হালকা উপসর্গ

- নাক থেকে জল পড়া, গা চুলকানো, চোখ চুলকানো, হাঁচি, কাশি, আর্টিকেরিয়া বা গায়ে লাল লাল হয়ে ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।
- একটু বেশি হলে শ্বাসকষ্ট, শ্বাসের মধ্যে সাঁই সাঁই আওয়াজ, ঠোঁট গলা ফুলে যাওয়া, মাথা ঝিম ঝিম করা, সিনকোপাল অ্যাটাক, অ্যানাফাইল্যাক্সিস।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিনগত কারণ থেকে অ্যালার্জি হয়। এটাকে অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস বলে।

অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিসের বিভিন্ন কারণ। যেমন ইমিউনো ফ্যাক্টর, পরিবেশগত ফ্যাক্টর। এগুলো ত্বকের প্রোটিনের গঠনে পরিবর্তন করে অ্যালার্জির উপসর্গ ঘটায়।

অ্যালার্জি জনিত অসুখ

- অ্যালার্জিক রাইনাইটিস।
- একজিমা (ত্বক)।
- অ্যাজমা।
- ফুড অ্যালার্জি।

অ্যানাফাইল্যাক্সিস হল খুব গুরুতর অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া যেটাকে মেডিকেল এমার্জেন্সি বলা হয় এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি।

অ্যালার্জির ধরন নিয়ে কিছু কথা

শ্বাস-প্রশ্বাসের অ্যালার্জির প্রসঙ্গে বলতে গেলে কী থেকে এটা হয় তা জানা জরুরি। যেমন—

- পোলেন বা পরাগরেণু।
- ডাস্ট মাইট।
- গৃহপালিত পশুর লোম।

এর উপসর্গ হল হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, নাক বন্ধ থাকা, নাক চুলকানো, এছাড়া শ্বাস নিতে কষ্ট এগুলো মূলত অ্যালার্জিজনিত অ্যাজমার লক্ষণ। যখন অ্যালার্জি জনিত কারণে অ্যাজমা হয় তখন বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই আওয়াজ এবং শ্বাসকষ্ট হয়। এর উদাহরণ হল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ও অ্যালার্জিক অ্যাজমা।

খাবার থেকে অ্যালার্জি

সবার না হলেও কিছু মানুষের কিছু কিছু খাবার থেকে অ্যালার্জি হয়। যেমন বাদাম, দুধ, ডিম, চিংড়িমাছ, গম, বেগুন, সামুদ্রিক মাছ, সয়া ইত্যাদি খাবারে অ্যালার্জি হয়। তাই এগুলোকে ফুড অ্যালার্জেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর উপসর্গ হল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট, জিভ, গলা খানিকটা চুলকোবে এবং ফুলে যাবে। এর সঙ্গে চামড়ার ওপর র‍্যাশ বের হয়। এছাড়া বমি হয়, ডায়রিয়াও হতে পারে, পেটে ব্যথা করে। এক্ষেত্রে অবস্থা যদি গুরুতর হয় তখন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

কিছু মানুষের কিছু কিছু খাবার থেকে অ্যালার্জি হয়। যেমন বাদাম, দুধ, ডিম, চিংড়িমাছ, গম, বেগুন, সামুদ্রিক মাছ, সয়া ইত্যাদি খাবারে অ্যালার্জি হয়। তাই এগুলোকে ফুড অ্যালার্জেন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর উপসর্গ হল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট, জিভ, গলা খানিকটা চুলকোবে এবং ফুলে যাবে। এর সঙ্গে চামড়ার ওপর র‍্যাশ বের হয়। এছাড়া বমি হয়, ডায়রিয়াও হতে পারে, পেটে ব্যথা করে।

ত্বকের অ্যালার্জি

কিছু কিছু প্রসাধন দ্রব্য, সাবান, কিছু মেটালিক দ্রব্য প্রধানত নিকেল, ল্যাটেক্সে অ্যালার্জি হয়। কিছু কিছু বিষাক্ত গাছের সংস্পর্শে এলেও হয়। এর উপসর্গগুলো হল ত্বকের যেখানে সংস্পর্শ ঘটে সেখানে লাল হয়ে চুলকোয়, র‍্যাশ বের হয় অথবা ত্বকে ছোট ছোট দানা দানা হয়ে ফুলে যায়। চামড়া শুষ্ক হয়ে জায়গাটা থেকে চামড়া উঠতে থাকে। এছাড়াও ছোট ছোট ফোস্কা হয় এবং তার থেকে জল গড়াতে থাকে। এটা হল কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস।

কিছু ওষুধ থেকে অ্যালার্জি

প্রধানত অ্যান্টিবায়োটিক। এর মধ্যে পেনিসিলিন, এনসেইড, কিছু কিছু কেমোথেরাপির ওষুধ প্রভৃতি। এতে ত্বকে র‍্যাশ বের হয়, চামড়ায় ছোট ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি দানা হয়, জ্বর আসে, ঠোঁট ও মুখ ফুলে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, রক্তচাপ কমে যায়।

পোকামাকড়ের কামড় থেকে অ্যালার্জি

মৌমাছির হুল, বিষাক্ত কোনো পোকার কামড় থেকেও অ্যালার্জি হয়। এর উপসর্গ হল কামড়ানোর জায়গায় ব্যথা হয়, লাল হয়ে ফুলে যায়। অর্থাৎ দেখা যায় যে জায়গায় হুল ফুটিয়েছে বা কামড় দিয়েছে সেই জায়গার চারপাশ খুব ফুলে যায়। গায়ে ছোট ছোট দানা বের হয়। যদি এটা গুরুতর পর্যায়ে যায় তাহলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তচাপ কমে যায়। এটাকে অ্যানাফাইল্যাক্সিস বলা হয়।

অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস

এটা চোখে হয়। কিছু কিছু সিজনে এটা বেশি হয়। যা পোলেন থেকে, ধুলোকণা থেকে, ধোঁয়া থেকে বা গৃহপালিত পশুর গায়ের লোম থেকে হতে পারে। এতে চোখ লাল হয়ে চুলকায়, জল পড়ে। ❑

অনুলিখন : সুব্রতা সাহা বসু

অ্যালার্জির বাড়াবাড়ি

ডাঃ নীলাদ্রি সরকার
(মেডিসিন বিশেষজ্ঞ)
মোবাইল : ৮৯৬১০৯৮৪১০

শীতকালে ঠান্ডা লেগে সর্দি-কাশির সমস্যা নতুন নয়। বাচ্চা থেকে বয়স্ক সকল মানুষ সর্দিজ্বরে ভুগে থাকেন। সর্দি-জ্বরের পাশাপাশি বাড়ে অ্যালার্জির সমস্যাও। অফিসের সহকর্মী থেকে পাশের বাড়ির প্রতিবেশী—খুসখুসে কাশি, শ্বাসকষ্ট নিয়ে বিপর্যস্ত অনেকেই।

শীতের বাতাস এমনিতে ভারী হয়। বাতাসে ধূলিকণাও বেশি থাকে। সে কারণে সহজেই বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস মানুষের শরীরে চট করে প্রবেশ করে। তাই ভাইরাসজনিত রোগ শীতে বেশি করে দেখা যায়। এর ওপর বায়ুদূষণ তো রয়েছেই। বছরের অন্যান্য সময় যে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে, তা নয়। শীতকালে বায়ুদূষণের কারণে অ্যালার্জির সমস্যা বাড়ে।

আমাদের শরীরের কোষে হিস্টামিন নামে একটি উপাদান বন্দী অবস্থায় থাকে। শরীর বান্ধব নয় এমন কিছু জিনিস শরীরে প্রবেশ করে হিস্টামিনের বন্দীত্ব ঘুচিয়ে দেয়। এর ফলে হিস্টামিন রক্তে ছড়িয়ে পড়ে আর রক্তে মেশার কারণে খারাপ প্রভাব পড়ে শরীরে।

শীতকালে এটা বেশি হয় কারণ এই সময় অ্যালার্জেনের সংখ্যা বাতাসে বেশি পরিমাণে থাকে। চোখ চুলকানো থেকে হাঁচি, কাশি, সর্দি, গলা খুসখুস, শ্বাসকষ্ট, র‍্যাশ সবকিছুর নেপথ্যে রয়েছে হিস্টামিন।

শীতকালীন অ্যালার্জির অন্যতম কারণ হিসেবে চিকিৎসকরা দায়ী করেন বায়ুদূষণকে। দূষণের কারণে যে সকলেই একই রকম ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বেন তা নয়। কিন্তু এক এক জনের মধ্যে অ্যালার্জির প্রবণতা বেশি থাকে। যেমন কারো রক্তে ইয়োসিনোফিলের পরিমাণ বেশি থাকে। কিংবা কারো হয়তো হিস্টামিন কোষ ভেঙে রক্তে মিশল না, সেক্ষেত্রে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন হবে। তবে শীতকালে বাতাসে দূষণের মাত্রা সব সময় বেশি থাকে। দীপাবলি পরবর্তী সময় থেকেই এই দূষণ বাড়তে থাকে।

শীতকালে শুকনো ধুলোও খুব বেশি ওড়ে। যেখানে বছরের অন্যান্য সময় এই শুকনো ধুলো ওড়ে কম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেই যত দূর চোখ যায় দেখা যাবে ধোঁয়ার চাদর যাকে আমরা কুয়াশা বলে ভুল করি। এই ধোঁয়া আমাদের জন্য কিন্তু খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়। তাই এই শীতের ভোরে কখনোই মর্নিং ওয়াক করা উচিত নয়। একটু বেলা হলে তবেই মনিং ওয়াকে যাওয়া উচিত। অনেকে ভাবে ঠান্ডার জন্য অ্যালার্জি হচ্ছে, ভুল—তাহলে তো ঠান্ডার দেশে সকলেই অ্যালার্জিতে ভুগতেন। তা তো হয় না।

হঠাৎ করেই শীতকালে অ্যালার্জির সমস্যা বেড়ে যায়। ঘরে ঘরে এক পরিস্থিতি। অ্যালার্জির রোগী তো বটেই, এমনকী এই রোগের সঙ্গে দূর-দূরান্তে যাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না তারাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কী কারণে এমন হচ্ছে? কোভিডের সময় এই ধরনের সমস্যা নিয়ে প্রচুর রোগী এসেছিলেন। কোভিড পর্ব কিছুটা পেরিয়ে

গেছে। এটা অনেকেই বুঝতে পারছেন না, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেল নাকি প্রকৃতির কোনো পরিবর্তন হল ? এত বেশি অ্যালার্জির রোগী ডাক্তারদের কাছে চিন্তার বিষয়। অনেকে বলছেন, শীতে যেহেতু বৃষ্টি হয় না তাই বাইরে ধুলোবালি ও বাতাসে জীবাণুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় অ্যালার্জির সমস্যা অসুবিধা করে। কারো কারো ক্ষেত্রে জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।

অনেক সময় ঘুরের ধুলোবালি পরিষ্কার করলে প্রথমে হাঁচি, পরে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

অ্যালার্জি কী

প্রতিটি মানুষের শরীরে একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম থাকে। কোনো কারণে এই ইমিউন সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিলে তখনই অ্যালার্জির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

অ্যালার্জিজনিত সর্দি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের উপসর্গ হচ্ছে অনবরত হাঁচি, নাক চুলকানো, নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারো কারো চোখ দিয়ে জল পড়ে এবং চোখ লাল হয়ে যায়।

প্রকারভেদ

অ্যালার্জিক রাইনাইটিস দু'ধরনের। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হলে একে সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়।

আর একটি হচ্ছে পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, যেখানে সারা বছর ধরে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণ

অ্যালার্জিজনিত সর্দি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের উপসর্গ হচ্ছে অনবরত হাঁচি, নাক চুলকানো, নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারো কারো চোখ দিয়ে জল পড়ে এবং চোখ লাল হয়ে যায়।

হল ঘনঘন হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া ও নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং চোখ দিয়ে জল পড়া।

পেরিনিয়াল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের উপসর্গগুলো ঋতুভিত্তিক। এক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর তীব্রতা কম হয় এবং স্থায়িত্বকাল বেশি হয়।

প্রতিরোধ

অ্যালার্জি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হল কারণকে চিহ্নিত করে সেটিকে এড়িয়ে চলা। রোগীকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে কী কারণে তার অ্যালার্জি হচ্ছে। যাদের অ্যালার্জির সমস্যা হয় তাদের শীতের ধুলোবালি ও গাড়ির কালো ধোঁয়া থেকে নিরাপদে থাকতে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসা

অ্যালার্জির কারণ এড়িয়ে চলা ল এই রোগের প্রধান চিকিৎসা। বিশেষ ওষুধ হল অ্যান্টিহিস্টামিন, স্টেরয়েড জাতীয় নাকের স্প্রে ব্যবহার। এছাড়া বয়সভেদে ট্যাবলেট জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যে কোনো ওষুধ ব্যবহার করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। ❑

নিরাময়ের জন্য চাই সঠিক রোগ নির্ণয়। আর সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন সঠিক টেস্ট। আর আপনার জানা চাই কোন রোগে কী টেস্ট।

অনুসন্ধানী পাঠক, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানদের জন্য এক অপরিহার্য বই।

লিখেছেন— ডা. সওকত আলী

নিছক বই নয়, অমূল্য সংগ্রহ।

সুস্বাস্থ্য প্রকাশনীর গর্বিত প্রকাশনা

■■

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাথে সথে জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন যেমন ধুলো, ধোঁয়া, ধূপ, মশার লিকুইড এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। বিছানা ও ঘর ধুলোমুক্ত রাখতে হবে। ঠান্ডা জল, আইসক্রিম, কোল্ডড্রিঙ্কস, কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ এড়িয়ে চলতে হবে। অসুখের তীব্রতা কম থাকলে প্রাণায়াম করা উচিত।

■■

অ্যালার্জিক অ্যাজমা

ডাঃ এস. কে. গুপ্ত
মোবাইল : ৯২৩১৬৬৬৬০৭

শীত এলেই অনেক মানুষের নাক বন্ধ, হাঁচি, কাশি বা শ্বাস কষ্টের সমস্যা বেড়ে যায়। ঠান্ডা ও শুষ্ক বাতাস, ধুলোবালি এবং ঘরের ভেতরে বেশি সময় কাটানো—এইসব মিলিয়ে শ্বাসযন্ত্রের ওপর চাপ পড়ে। বিশেষ করে যাদের অ্যালার্জির প্রবণতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে শীতে অ্যালার্জিক অ্যাজমা নতুন করে শুরু হতে পারে বা পুরনো সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে।

অনেকে হয়তো বলবেন যে, অ্যালার্জি আর অ্যাজমা আলাদা দুটো রোগ। কিন্তু বাস্তবে এই দুটোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক।

অ্যালার্জি ও অ্যাজমার কেন এত মিল

• অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অ্যালার্জি আছে এমন বহু মানুষের মধ্যেই অ্যাজমার লক্ষণ পাওয়া যায়। আবার যাদের অ্যাজমা আছে, তাদের অনেকেরই নাক বা ত্বকের অ্যালার্জি থাকে। অর্থাৎ, এই দুটি সমস্যা অনেক সময় পাশাপাশি চলে।

• যে সব জিনিসে সাধারণত অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন ফুলের রেণু, ঘরের ধুলো, ডাস্ট মাইট বা পোষা প্রাণীর লোম এগুলোই কিছু মানুষের ক্ষেত্রে শ্বাসনালীকে উত্তেজিত করে অ্যাজমার উপসর্গ তৈরি করে। এই কারণেই এই ধরনের অ্যাজমাকে অ্যালার্জিক অ্যাজমা বলা হয়।

শরীরে কীভাবে শুরু হয় এই সমস্যা

আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম মূলত ক্ষতিকর জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। কিন্তু অ্যালার্জির ক্ষেত্রে এই সিস্টেম কখনো কখনো নিরীহ জিনিসকেও বিপজ্জনক মনে করে ফেলে।

যখন শরীর কোনো অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে আসে, তখন—

• শরীর বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

• ফলে কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়।

• এগুলো নাক, চোখ বা ত্বকে অ্যালার্জির লক্ষণ তৈরি করে।

কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া শুধু নাক বা চোখেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে পৌঁছে গিয়ে—

• শ্বাসনালি সংকুচিত করে।

• ভেতরে প্রদাহ তৈরি করে।

• শ্বাস নিতে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

ফলাফল হিসেবে দেখা দেয় কাশি, সাঁই সাঁই শব্দে শ্বাস বা বুক চেপে আসার মতো অ্যাজমার লক্ষণ।

অ্যালার্জি ও অ্যাজমার চিকিৎসা একসাথে সম্ভব?

সাধারণভাবে অ্যালার্জি ও অ্যাজমার চিকিৎসা আলাদা হলেও, কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যা দুটো সমস্যাতেই উপকার দেয়।

কিছু ওষুধ শরীরের অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ার সময় তৈরি হওয়া রাসায়নিকের অভাব কমায়,

ফলে নাকের অ্যালার্জির পাশাপাশি শ্বাসকষ্টও নিয়ন্ত্রণে থাকে।

গুরুতর অ্যালার্জিক অ্যাজমার ক্ষেত্রে আধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এমন কিছু ওষুধ ব্যবহার হচ্ছে, যা শরীরের নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। এর ফলে অ্যালার্জির তীব্রতা কমে এবং অ্যাজমার উপসর্গও হালকা হয়।

কারা বেশি ঝুঁকিতে থাকেন

কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অ্যালার্জিক অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি

- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অ্যালার্জির ইতিহাস থাকলে।
- নিজের যদি ত্বকের অ্যালার্জি বা খাবারের অ্যালার্জি থাকে।
- শৈশব থেকেই অ্যালার্জির প্রবণতা থাকলে।

সব অ্যাজমাই কি অ্যালার্জির জন্য?

অ্যালার্জিক অ্যাজমা খুব সাধারণ হলেও, অ্যাজমার অন্য কারণও রয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রে—

- ঠান্ডা বাতাসে ব্যায়াম।
- শ্বাসনালির সংক্রমণ।
- মানসিক চাপ।
- গ্যাস্ট্রিক বা অ্যাসিড রিফ্লাক্স।

এই কারণগুলোও অ্যাজমার সমস্যা বাড়াতে পারে।

অনেক রোগীর ক্ষেত্রে একাধিক ট্রিগার একসঙ্গে কাজ করে, তাই চিকিৎসাও ব্যক্তিভেদে আলাদা হয়।

উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে নিজের ভূমিকা

অ্যালার্জিক অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ হল নিজের কী কারণে অ্যালার্জি হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করা এবং যতটা সম্ভব সেগুলো এড়িয়ে চলা।

এর পাশাপাশি নিয়মিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং সময়ের সঙ্গে উপসর্গের পরিবর্তন লক্ষ্য করা জরুরি। কারণ অ্যালার্জি ও অ্যাজমার প্রকৃতি সময়ের সঙ্গে বদলাতে পারে, আর সেই অনুযায়ী চিকিৎসার পরিকল্পনাও বদলানো প্রয়োজন হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—

শ্বাসকষ্ট বাড়ার আগাম লক্ষণগুলো চিনে নেওয়া এবং প্রয়োজন হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া।

সব মিলিয়ে বলা যায় যে, অ্যালার্জিক অ্যাজমা একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য শ্বাসজনিত সমস্যা, যদি তা সময়মতো সঠিকভাবে চিহ্নিত ও ব্যবস্থাপনা করা যায়। নিজের ট্রিগার সম্পর্কে সচেতন থাকা, প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো এড়িয়ে চলা এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলাই এই রোগের নিয়ন্ত্রণের মূল ভিত্তি। চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, নিয়মিত ফলো-আপ ও ব্যক্তিভিত্তিক চিকিৎসা পরিকল্পনার মাধ্যমে উপসর্গের তীব্রতা কমানো এবং রোগীর জীবনমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা সম্ভব। সচেতনতা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং সঠিক চিকিৎসার সমন্বয়ই দীর্ঘমেয়াদে অ্যালার্জিক অ্যাজমা ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে কার্যকর পথ।

অ্যালার্জিক অ্যাজমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

অ্যালার্জিক অ্যাজমায় হোমিওপ্যাথিতে সুচিকিৎসা সম্ভব। রোগীর লক্ষণ এবং অসুখের লক্ষণ অনুযায়ী সঠিক হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নির্বাচন করা হয়। এই চিকিৎসায় রোগীর উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হয়, বেশির ভাগ রোগীই এই অসুখের কষ্টকর লক্ষণ থেকে চিরতরে মুক্তি পায়। অ্যালার্জিক অ্যাজমার ক্ষেত্রে ওষুধ নির্বাচন নির্ভর করে উত্তেজক কারণ বা ট্রিগার, কোন সময়ে রোগের বৃদ্ধি, আবহাওয়া পরিবর্তনে প্রভাব ও রোগীর মানসিক লক্ষণের ওপর। সাধারণত নির্বাচিত ওষুধটি ৬সি, ৩০সি, ২০০সি ব্যবহৃত হয়। অসুখের তীব্রতা অনুযায়ী ও ব্যক্তিভেদে নির্বাচিত ওষুধটির ডোজ পরিবর্তন হতে পারে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাথে সথে জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন যেমন ধুলো, ধোঁয়া, ধূপ, মশার লিকুইড এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। বিছানা ও ঘর ধুলোমুক্ত রাখতে হবে। ঠান্ডা জল, আইসক্রিম, কোল্ডড্রিঙ্কস, কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ এড়িয়ে চলতে হবে। অসুখের তীব্রতা কম থাকলে প্রাণায়াম করা উচিত। অ্যাজমার ক্ষেত্রে অবশ্যই অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ওষুধ গ্রহণ করা উচিত।

নিম্নলিখিত ওষুধগুলো রোগীর লক্ষণ, অসুখের লক্ষণ অনুযায়ী সাধারণত নির্বাচিত হয়—

আর্সেনিক অ্যালবাম

কোনো রোগীর যদি মধ্যরাতের পরে অর্থাৎ রাত ১২টা থেকে ভোর ৩টে, এই সময়ে যদি শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়, এছাড়াও যখন রোগীর অস্থিরতা হয়, ভয়, উদ্বেগ হয়, বুকে জ্বালাপোড়া অনুভূতি হয় তখনও এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের রোগীর ঠান্ডা বাতাসে কষ্ট বাড়ে, উষ্ণতায় আরাম হয়। এই লক্ষণটি যদি দেখা যায়, তখন আর্সেনিকাম অ্যালবাম ব্যবহার করা হয়।

ইপিক্যাকুয়ানজা

এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয় যখন রোগীর অবিরাম সোঁ সোঁ শব্দ সহ শ্বাসকষ্ট, কাশির সঙ্গে বমি ভাব বা বমি হয়, যখন রোগী কাশছে কিন্তু কেশেও আরাম হচ্ছে না, বুকে কফ জমে থাকে, ঘড়ঘড় শব্দ হয়।

ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম

স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বা বর্ষাকালের সময় যখন অ্যাজমা বাড়ে, তখন ঘন সবুজাভ কফ লক্ষ্য করা যায়। ভোরবেলা নাগাদ এই উপসর্গ বেশি দেখা যায়। এই সময় ন্যাট্রাম সালফিউরিকাম ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এতে রোগী অনেকটাই উপকৃত হয়।

ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস

যখন রোগীর তীব্র শ্বাসকষ্ট হয়, শুয়ে থাকতে পারেন না, বসে শ্বাস নিতে হয় তখন এই ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস ব্যবহার করা হয়।

অ্যান্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম

যখন রোগীর বুকে অতিরিক্ত কফ জমে,জোরে ঘড়ঘড় শব্দ হয় কিন্তু কফ বেরোতে কষ্ট হয়, এছাড়াও দুর্বল লাগে, ঝিমুনি হয়, তখন এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ❑

অ্যালার্জি

নানা রূপ ও নানা সমস্যা

ডাঃ বিকাশ মন্ডল
মোবাইল : ৯৪৩৩৬২৭৩৪৭, ৬২৯১৫২০৯৮৩

অ্যালার্জি হল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার এমন একটি অতি–সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া, যা সাধারণত ক্ষতিকারক নয় এমন কিছু পদার্থের (যেমন পরাগ, ধুলো, খাবার, পশুর লোম প্রভৃতি) কারণে ঘটে। এই পদার্থগুলোকে অ্যালার্জেন বলা হয় এবং এদের সংস্পর্শে এলে শরীর অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়, যার ফলে হাঁচি, সর্দি–কাশি, চুলকানি, ফুসকুড়ি, শ্বাসকষ্টের মতো নানা লক্ষণ দেখা যায়।

অ্যালার্জির মূল কারণ

● শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন কোনো নিরীহ জিনিসকে (অ্যালার্জেন) ভুলবশত বিপজ্জনক ভেবে আক্রমণ করে, তখন অ্যালার্জির সূত্রপাত হয়।

● এই প্রতিক্রিয়ার ফলে শরীর কিছু রাসায়নিক পদার্থ (যেমন হিস্টামিন) নিঃসরণ করে, যা অ্যালার্জির লক্ষণগুলো প্রকাশ করে।

সাধারণ অ্যালার্জেন

● **বাতাসবাহিত :** পরাগ, ধুলোবালি, মাইট, পশুর লোম।

● **খাবার :** বাদাম, শেলফিস, ডিম, দুধ, গম, সয়া, মাছ ।

● **অন্যান্য :** পোকামাকড়ের কামড় (মৌমাছি, বোলতা), কিছু ওষুধ যেমন পেনিসিলিন, ল্যাটেক্স।

সাধারণ লক্ষণ

● হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, নাক বন্ধ থাকা, চোখ চুলকানো ও জল পড়া।

● ত্বকে ফুসকুড়ি, লালচে ভাব, চুলকানি (একজিমা বা আমবাত)।

● শ্বাসকষ্ট, কাশি, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ (অ্যাজমা)।

● পেটের সমস্যা (ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব)।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

● খাবার থেকে হওয়া সমস্যা (ফুড ইনটলারেন্স) এবং ফুড অ্যালার্জি এক নয়। ইনটলারেন্সে ইমিউন সিস্টেম জড়িত থাকে না।

● অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া হালকা থেকে গুরুতর (অ্যানাফাইল্যাক্সিস) হতে পারে, এমনকী জীবনঘাতি হতে পারে।

অ্যালার্জি রোগটা সাধারণ এবং ক্রমবর্দ্ধমান রোগ বৃদ্ধির কারণ। বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৫ থেকে ২০ জন আক্রান্ত। বিভিন্ন অঙ্গে দেখা দিতে পারে। সাধারণত আইজিই ইমিউন রেসপন্স বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অথবা পরিবেশের মধ্যস্থিত কতকগুলো বস্তুর উপস্থিতিতে কিছু কিছু ব্যক্তির অতি সংবেদনশীলতার কারণে সৃষ্ট কতকগুলো তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে বোঝায় । এই বস্তুগুলো অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত রোগে সমস্যা তৈরি করে।

অ্যালার্জি স্বাস্থ্যের একটা সাধারণ সমস্যা যখন বাইরের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেনো বাইরের পদার্থ বা অ্যালার্জেনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখায় তখন তাকে অ্যালার্জি বলে। অনেক লোকের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া হয় না । অ্যালার্জির তীব্রতা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। বেশিরভাগ অ্যালার্জি, নিরাময় করা যায় না, তবে উপসর্গগুলোর উপশম করতে সাহায্য করার মতো চিকিৎসা পদ্ধতি আছে।

অ্যালার্জি জনিত রোগগুলি দৃঢ়ভাবে

পারিবারিক, অভিন্ন যমজদের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ সময়ে একই অ্যালার্জি জনিত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

নানা অঙ্গের অ্যালার্জির সমস্যা

ত্বকে

আর্টিকেরিয়া বা আমবাত, অ্যাটপিক ডার্মাটাইটিস, অ্যাঞ্জিওইডিমা, অ্যালার্জিক কনট্যাক্ট একজিমা ।

শ্বাসযন্ত্রে

অ্যাজমা, অ্যাটপিক রাইনাইটিস, হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, নাক বন্ধ থাকা, চোখ চুলকানো ও জল পড়া। কাশি, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ।

চোখে

অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস।

পেটে

ফুড অ্যালার্জি (ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব)।

অন্যান্য

ড্রাগ অ্যালার্জি, অ্যানাফাইলেক্সিস।

মৌসুমী অ্যালার্জি

হে ফিভার, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস।

কারণ – জিনগত এবং পরিবেশগত।

পরীক্ষা – উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে রক্ত পরীক্ষা, সেরাম আইজিই পরীক্ষা করা হয়।

বিভিন্ন অ্যালার্জেন, অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। যেমন পরাগ, গাছপালা, খাবার, নির্দিষ্ট ওষুধ ইত্যাদি।

চাই সুষম খাবার

সকলেরই নিজস্ব একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। কোনো কারণে সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থায় গোলযোগ দেখা দিলে তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অ্যালার্জি জাতীয় সমস্যা দেখা যায়। এই সবের আগে প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক রাখা প্রয়োজন। তার জন্য শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থের সরবরাহ প্রয়োজন। সুষম খাদ্য, দুধ, প্রতি ঋতুর শাকসবজি, ফল খাদ্যতালিকায় অবশ্যই থাকা চাই।

শীতের মরশুমে সর্দি–কাশির পাশাপাশি বাড়ে অ্যালার্জির সমস্যাও। শীতের বাতাস ভারি হয়। সেই কারণে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস মানুষের শরীরে চুপ করে প্রবেশ করে। ভাইরাসজনিত রোগ শীতে বেশি দেখা যায়। অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্টের মতো রোগ অনেক ক্ষেত্রে একসঙ্গে হয়। বাতাসে ধুলোকণা বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে ব্যাক্টেরিয়া শরীরে প্রবেশ করে। সেগুলোর প্রতিক্রিয়া থেকে অ্যালার্জি হয়।

অ্যালার্জি স্বাস্থ্যের একটা সাধারণ সমস্যা যখন বাইরের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেনো বাইরের পদার্থ বা অ্যালার্জেনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখায় তখন তাকে অ্যালার্জি বলে। অনেক লোকের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া হয় না । অ্যালার্জির তীব্রতা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়।

অ্যালার্জির নানান প্রতিক্রিয়া

খুব চেনা অ্যালার্জি রাইনাইটিস। এতে নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়ে। চুলকানি হয়, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে ইনফেকশন হয়ে সাইনুসাইটিস হয়ে থাকে। ঘরে সামান্য ধুলো পরিষ্কার করলে বা ধুলো নাকে আসার কারণে এ জাতীয় অস্বস্তির শিকার হন অনেকে। ত্বকের ক্ষেত্রে আর্টিকেরিয়া অর্থাৎ আমবাতের কারণে চামড়া লাল হয়ে যায় ও গোল গোল চাকা চাকা দাগ হয়। অ্যাঞ্জিওডেমো থাকলে রোগীর অ্যালার্জির প্রকোপ বেশি হয়। ঠোঁট ফুলে যায়, গলা ভারি হয়ে বুজে আসে, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ফুসফুসের ক্ষেত্রে অ্যালার্জি মানে অ্যাজমা। এতে বুক ভারি হয়ে জ্বালা করে, শ্বাসকষ্ট হয়। শ্বাসের সঙ্গে সাঁই সাঁই আওয়াজের সঙ্গে কাশি শুরু হয়।

খাওয়া বন্ধে অ্যালার্জি কমে

গ্লুটেন সমৃদ্ধ খাবার যেমন আটা, ময়দা, বার্লি, ওটস ও ডালিয়া প্রভৃতি শরীরের জন্য উপকারি হলেও এর মধ্যে থাকা প্রোটিন অনেকের অ্যালার্জি সৃষ্টি করে।

আবার বিভিন্ন রকমের সামুদ্রিক মাছ অর্থাৎ চিংড়ি, কাঁকড়া, ডিম ও দুধ, দুধের তৈরি খাবার এই তালিকায় পড়ে। তবে মায়ের বুকের দুধের কোনো তুলনা হয় না। বরং ছোট শিশুকে নিয়মিত স্তন্যপান করালে তার সুফল হিসেবে আগামী দিনে নানা অ্যালার্জি প্রতিরোধ করা যায়।

যাদের অ্যালার্জির প্রবণতা রয়েছে তারা পুঁইশাক, পালংশাক ও বেগুন এড়িয়ে চলুন।

অ্যালার্জির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

হোমিওপাথিতে অ্যালার্জির ভালো চিকিৎসা আছে। লক্ষণ ভিত্তিক এই চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে এপিস মেল, আর্টিকেরিয়া ইউ, আর্সেনিক, রাসটক্স, সালফার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পরে কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন যেমন থুজা, ব্যাসিলিনাম, ন্যাট্রাম মিউর, সোরিনাম, পালসেটিলা, লাইকোপোডিয়াম, সিফিলিনাম প্রভৃতি খুবই উপকার দেয়। চিকিৎসা অবশ্যই সুচিকিৎসকের হাতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ❑

অ্যালার্জির ঘরোয়া দাওয়াই

ডাঃ সকুমার দাস

আজকাল, অ্যালার্জি যেন আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারও হাঁচি-কাশি লেগেই আছে, কারও চোখ চুলকায়, আবার কারও ত্বকে লালচে ফুসকুড়ি। একটু ধুলোবালি, আবহাওয়ার পরিবর্তন বা কোনো খাবার থেকে সমস্যা শুরু হয়। অনেকেই নিয়মিত ওষুধ খান, কিন্তু লাগাতার ওষুধ খাওয়াও শরীরের জন্য ভালো নয়। তাই অনেকেই এখন অ্যালার্জির ঘরোয়া দাওয়াইয়ের দিকে ঝুঁকছেন। অ্যালার্জি কী, কেন হয় এবং ঘরে বসেই কীভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে অ্যালার্জির সমস্যা অনেকটা কমিয়ে আনা যায়— দেখা যাক।

অ্যালার্জি আসলে কী

অ্যালার্জি কোনো রোগ নয়। এটি আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া। সাধারণত যেসব জিনিস, শরীরের ক্ষতি করে না—যেমন ধুলো, ফুলের রেণু, ঠান্ডা বাতাস বা কিছু খাবার—সেগুলোকেই শরীর ভুল করে শত্রু মনে করে। তখনই শুরু হয় হাঁচি, চুলকানি, কাশি বা ত্বকের সমস্যা।

কেন হয় অ্যালার্জি

অ্যালার্জির কারণ একেকজনের ক্ষেত্রে

একেক রকম হতে পারে। তবে সাধারণ কারণগুলো হলো—

- ধুলোবালি ও ময়লা।
- ফুলের পরাগরেণু।
- ঠান্ডা বা গরম আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন, ধোঁয়া ও দূষণ।
- কিছু খাবার (ডিম, চিংড়ি, বাদাম ইত্যাদি)।
- বংশগত প্রভাব।
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়া।

অ্যালার্জির সাধারণ লক্ষণ

অ্যালার্জি হলে সাধারণত যেসব লক্ষণ দেখা যায়—

- বারবার হাঁচি।
- নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ থাকা, চোখ চুলকানো ও জল পড়া।
- গলা চুলকানো।
- কাশি।
- ত্বকে চুলকানি বা ফুসকুড়ি।
- মাথাব্যথা ও ক্লান্তি।

সব লক্ষণ একসঙ্গে নাও দেখা দিতে পারে। কারও ক্ষেত্রে শুধু ত্বকের সমস্যা, আবার কারও ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট বেশি হয়।

অ্যালার্জির ঘরোয়া দাওয়াই

ভাগ্য ভালো যে আমাদের রান্নাঘরেই এমন অনেক উপাদান আছে, যেগুলো নিয়মিত ব্যবহার করলে অ্যালার্জির কষ্ট অনেকটাই কমে যায়।

■ মধু : প্রাকৃতিক ওষুধ

মধু অ্যালার্জির জন্য খুবই উপকারী। এটি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

যেভাবে খাবেন

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ১ চা চামচ খাঁটি মধু খেতে পারেন। চাইলে কুসুম গরম জলের

সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়।

<u>উপকারিতা</u>

•হাঁচি ও নাক দিয়ে জল পড়া কমায়।

•গলায় আরাম দেয়।

•গলার চুলকানি কমায়।

•কাশি ও শ্বাসকষ্টে আরাম দেয়।

■ **আদা : কাশি ও গলার জন্য দারুণ**

আদা বহুদিন ধরেই ঘরোয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

<u>যেভাবে ব্যবহার করবেন</u>

আদা কুচি দিয়ে চা বানিয়ে পান করুন অথবা কাঁচা আদার ছোট টুকরো চিবিয়ে খান।

■ **হলুদ : প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে**

হলুদ প্রাকৃতিকভাবে শরীরের ভেতরের প্রদাহ কমায়।

<u>যেভাবে খাবেন</u>

এক গ্লাস গরম দুধে আধা চা চামচ হলুদ মিশিয়ে রাতে পান করুন।

<u>উপকারিতা</u>

• ত্বকের অ্যালার্জিতে ভালো কাজ করে।

• শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

■ **তুলসী পাতা : সহজ ও কার্যকর**

তুলসী পাতাকে বলা হয় ভেষজ গাছের রানি।

<u>ব্যবহার পদ্ধতি</u>

প্রতিদিন সকালে ৪–৫টি তুলসী পাতা চিবিয়ে খান অথবা তুলসী পাতা ফুটিয়ে চা বানিয়ে পান করুন।

<u>উপকারিতা</u>

•নাক, ও গলার অ্যালার্জি কমায়।

•ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করে।

■ **লবণ জলের গার্গল**

গলার অ্যালার্জির জন্য এটি খুব সহজ একটি উপায়।

<u>যেভাবে করবেন</u>

এক গ্লাস কুসুম গরম জলেতে আধ চা চামচ লবণ মিশিয়ে দিনে ২ বার গার্গল করুন।

<u>উপকারিতা</u>

•গলার চুলকানি ও ব্যথা কমায়।

•জীবাণু নষ্ট করে।

■ **নারকেল তেল : ত্বকের জন্য উপকারি**

■ ■

অ্যালার্জি খুব পরিচিত সমস্যা হলেও এটিকে অবহেলা করা ঠিক নয়। নিয়মিত যত্ন, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন আর কিছু সহজ ঘরোয়া দাওয়াই মানলেই অনেক সময় ওষুধ ছাড়াই আরাম পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে, সব মানুষের শরীর এক রকম নয়। কোনো কিছুতে সমস্যা বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করুন।

■ ■

যাদের ত্বকে অ্যালার্জি হয়, তাদের জন্য নারকেল তেল খুবই ভালো।

<u>ব্যবহার পদ্ধতি</u>

চুলকানি বা ফুসকুড়ির জায়গায় দিনে ২–৩ বার নারকেল তেল লাগান

<u>উপকারিতা</u>

•ত্বক নরম রাখে।

•চুলকানি ও জ্বালা কমায়।

•ভিটামিন–সি সমৃদ্ধ খাবার।

•ভিটামিন সি অ্যালার্জি কমাতে সাহায্য করে।

<u>ভিটামিন–সি–এর উৎস</u>

•লেবু।

•কমলা।

•আমলকি।

•পেয়ারা।

<u>উপকারিতা</u>

শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

অ্যালার্জির তীব্রতা কমায়।

প্রচুর জল পান করুন।

অনেকে এই বিষয়টি অবহেলা করেন, কিন্তু জল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

<u>উপকারিতা</u>

শরীর থেকে ক্ষতিকর উপাদান বের করে নাক ও গলা আর্দ্র রাখে।

অ্যালার্জি এড়াতে দৈনন্দিন অভ্যাস

ঘরোয়া দাওয়াইয়ের পাশাপাশি কিছু অভ্যাস বদলানো দরকার—

•ঘর পরিস্কার রাখুন।

•ধুলোবালি এড়িয়ে চলুন।

•বাইরে থেকে এসে হাত–মুখ ধুয়ে নিন।

•বিছানার চাদর ও বালিশ নিয়মিত ধুয়ে নিন।

•ধোঁয়া ও ধূমপান থেকে দূরে থাকুন।

কখন অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন

ঘরোয়া উপায়ে আরাম না পেলে বা নিচের সমস্যাগুলো হলে দেরি না করে ডাক্তারের কাছে যান—

•শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া।

•মুখ বা গলা ফুলে যাওয়া।

•দীর্ঘদিন অ্যালার্জি না কমা।

•তীব্র ত্বক সমস্যা।

অ্যালার্জি খুব পরিচিত সমস্যা হলেও এটিকে অবহেলা করা ঠিক নয়। নিয়মিত যত্ন, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন আর কিছু সহজ ঘরোয়া দাওয়াই মানলেই অনেক সময় ওষুধ ছাড়াই আরাম পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে, সব মানুষের শরীর এক রকম নয়। কোনো কিছুতে সমস্যা বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করুন। ❑

আংশিক বা সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন

আপনার জন্য কোনটা সেরা?

ডাঃ ইন্দ্রনীল পাল
(কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিক এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জেন)
মোবাইল : ৮৩৩৬৯৮৫২৫০, ৮৪২০০১২৬৭১

হাঁটু আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্টগুলোর একটি। হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো, সিঁড়ি ওঠা-নামা—প্রায় সব দৈনন্দিন কাজেই হাঁটুর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বা দীর্ঘদিনের আর্থ্রাইটিস, চোট, অতিরিক্ত ওজন কিংবা বংশগত কারণে হাঁটুর জয়েন্ট ক্ষয়ে যেতে পারে। তখন শুরু হয় ব্যথা, শক্ত হয়ে যাওয়া, হাঁটতে কষ্ট, রাতের ঘুম নষ্ট হওয়া এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হওয়া।

অনেক রোগীই তখন প্রশ্ন করেন—

''আমার কি হাঁটু প্রতিস্থাপন করতে হবে?''

''পার্শিয়াল' (আংশিক) না 'টোটাল'(সম্পূর্ণ) নী রিপ্লেসমেন্ট—কোনটা আমার জন্য ভালো?''

হাঁটু জয়েন্ট আসলে কীভাবে কাজ করে?

হাঁটু জয়েন্ট মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত—

■ **মিডিয়াল কম্পার্টমেন্ট**—হাঁটুর ভেতরের দিক।

■ **ল্যাটারালকম্পার্টমেন্ট**—হাঁটুর বাইরের দিক।

■ **প্যাটেলো-ফেমোরাল কম্পার্টমেন্ট** — হাঁটুর সামনের দিক (হাঁটু ঢাকনি)।

স্বাভাবিক অবস্থায় এই তিনটি অংশেই মসৃণ কার্টিলেজ থাকে, যা হাঁটুকে ব্যথামুক্ত ও সহজে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। কিন্তু আর্থ্রাইটিস হলে এই কার্টিলেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং হাড়ে-হাড়ে ঘষা লাগে, ফলে ব্যথা শুরু হয়।

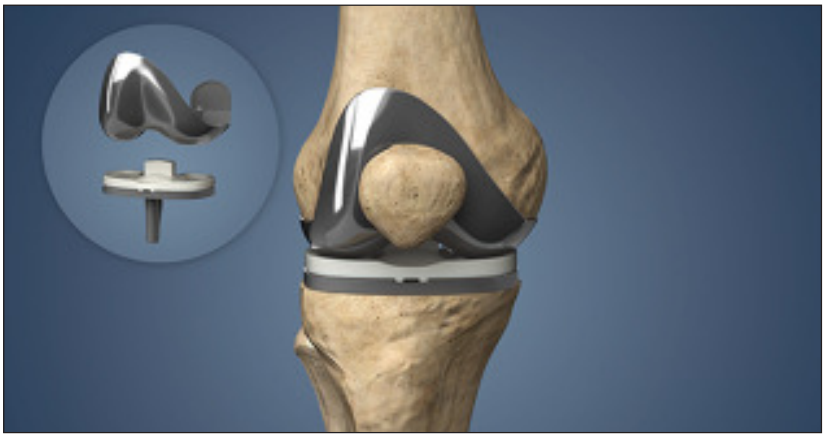

হাঁটুর আর্থ্রাইটিস কেন হয়?

সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলো হল—

- **অস্টিওআর্থ্রাইটিস** (বয়সজনিত ক্ষয়)।
- **রিউমাটয়েডআর্থ্রাইটিস**।
- পুরনো চোট বা দুর্ঘটনা।
- **অতিরিক্ত ওজন**।
- **হাঁটুর ভুল অ্যালাইনমেন্ট** (বো-লেগ বা নক-নী)।
- পারিবারিক বা বংশগত কারণ।

শুরুর দিকে ওষুধ, ফিজিওথেরাপি, ইনজেকশন ও লাইফস্টাইল পরিবর্তনে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু যখন এসব কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তখনই আসে **নী রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি**-র কথা।

নী রিপ্লেসমেন্ট বা হাঁটু প্রতিস্থাপন মানে কী?

হাঁটু প্রতিস্থাপন হল এমন একটি অপারেশন যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত জয়েন্টের অংশ সরিয়ে সেখানে **কৃত্রিম জয়েন্ট (ইমপ্লান্ট)**বসানো হয়, যাতে ব্যথা কমে এবং হাঁটুর স্বাভাবিক নড়াচড়া ফিরে আসে।

হাঁটু প্রতিস্থাপন মূলত দুই ধরনের—

- **পার্শিয়াল নী রিপ্লেসমেন্ট বা আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপন (পিকেআর)**।
- **টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট বা সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন (টিকেআর)**।

আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপন কী?

আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপনে হাঁটুর **শুধু ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি** পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ, যদি হাঁটুর একটি কম্পার্টমেন্ট নষ্ট হয় এবং বাকি অংশগুলো ভালো থাকে, তাহলে পুরো হাঁটু না বদলে শুধু ওই অংশটুকুই প্রতিস্থাপন করা যায়।

কখন আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপন করা যায়?

- আর্থ্রাইটিস যদি হাঁটুর **একটি অংশেই সীমাবদ্ধ** থাকে।

●হাঁটুর লিগামেন্টগুলো (বিশেষ করে ACC) যদি ভালো থাকে।

●হাঁটুর বিকৃতি খুব বেশি না হয়।

●রোগীর ওজন তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে।

আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের সুবিধা

●ছোট অপারেশন।

●কম রক্তক্ষরণ।

●কম ব্যথা।

●দ্রুত হাঁটা শুরু করা যায়।

●হাঁটুর অনুভূতি অনেকটাই স্বাভাবিক থাকে।

●হাসপাতালে থাকার সময় কম।

●দ্রুত দৈনন্দিন কাজে ফেরা যায়।

আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের সীমাবদ্ধতা

●সব রোগীর জন্য উপযোগী নয়।

●ভবিষ্যতে অন্য অংশে আর্থ্রাইটিস হলে আবার অপারেশন লাগতে পারে।

●খুব অভিজ্ঞ সার্জন প্রয়োজন।

●দীর্ঘমেয়াদে কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন দরকার হতে পারে।

সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন কী?

সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপনে হাঁটুর **তিনটি কম্পার্টমেন্টই প্রতিস্থাপন** করা হয়। অর্থাৎ পুরো হাঁটু জয়েন্ট নতুন করে তৈরি করা হয় কৃত্রিম ইমপ্লান্ট দিয়ে।

কখন সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হয়?

●হাঁটুর একাধিক অংশে আর্থ্রাইটিস থাকলে।

●ব্যথা খুব বেশি হলে।

●হাঁটুর বিকৃতি বেশি হলে।

●হাঁটু শক্ত হয়ে গেলে।

●আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপন করার মতো অবস্থা না থাকলে।

সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপনের সুবিধা

●দীর্ঘদিনের ব্যথা থেকে মুক্তি।

●অধিকাংশ রোগীর জন্য উপযোগী।

●ভবিষ্যতে আবার অপারেশনের সম্ভাবনা কম।

●গুরুতর আর্থ্রাইটিসেও কার্যকর।

●বহু বছরের প্রমাণিত সাফল্য।

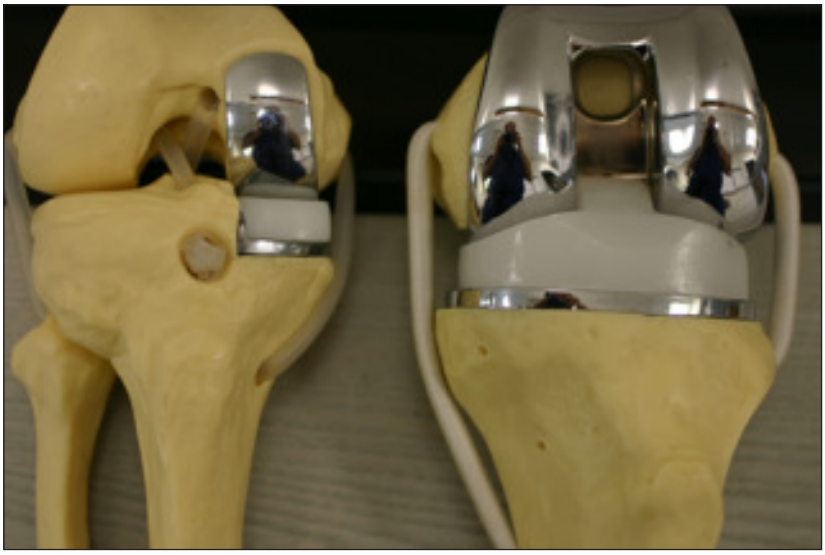

সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপনের কিছু অসুবিধা

●অপারেশন তুলনামূলক বড়।

●রিকভারি সময় একটু বেশি।

●হাঁটুর অনুভূতি পুরোপুরি স্বাভাবিক নাও লাগতে পারে।

●ফিজিওথেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর্শিক বনাম সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপনের তুলনা

বিষয়	আংশিক প্রতিস্থাপন	সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন
প্রতিস্থাপন	হাঁটুর একটি অংশ	পুরো হাঁটু
অপারেশন	ছোট	বড়
ব্যথা	তুলনামূলক কম	তুলনামূলক বেশি
রিকভারি	দ্রুত	বেশি সময় লাগে
ভবিষ্যৎ	অপারেশন লাগতে পারে	সাধারণত লাগে না

কোনটি আপনার জন্য সেরা?

এই প্রশ্নের উত্তর সবার জন্য এক নয়। সিদ্ধান্ত নির্ভর করে—

●আপনার বয়স ও ওজন।

●হাঁটুর ক্ষতির পরিমাণ।

●এক্স-রে বা এমআরআই রিপোর্ট।

●দৈনন্দিন কাজের ধরন।

●ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অভিজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জনের সঠিক মূল্যায়ন।

ভুল ধারণা ভাঙা জরুরি

'আংশিক করলে পরে নিশ্চিত সম্পূর্ণ করতে হবে'—সব ক্ষেত্রে নয়।

'সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন করলে হাঁটু আর ভাঁজ হবে না'—ভুল।

'বয়স বেশি হলে অপারেশন করা যায় না'—সম্পূর্ণ ভুল

অপারেশনের পর জীবন কেমন হয়?

উভয় ক্ষেত্রেই—

নিয়মিত ফিজিওথেরাপি জরুরি।

ওজন নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ।

সক্রিয় জীবনযাপন সম্ভব।

ব্যথামুক্ত হাঁটা ও স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব।

উপসংহার

আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপন উপযুক্ত তখনই, যখন হাঁটুর ক্ষয় সীমিত এবং রোগীর অবস্থা নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে।

সম্পূর্ণ হাঁটু প্রতিস্থাপন হল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান, বিশেষ করে গুরুতর আর্থ্রাইটিসে।

সঠিক রোগীর জন্য সঠিক অপারেশনই সেরা অপারেশন।

অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই আপনার অর্থোপেডিক সার্জনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করুন, সব প্রশ্ন করুন এবং তবেই সিদ্ধান্ত নিন। ❑

কোলেস্টেরল বাড়লে অনেক বিপদ

ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস
(বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ)
মোবাইল : ৯৮৩১১৭০৪৮৩

কোলেস্টেরল হল মোমের মতো এক ধরনের চর্বি জাতীয় পদার্থ। এটি মানুষের লিভারে তৈরি হয়। কোষের কাজ চালাতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা কিন্তু কোলেস্টেরল যোগান দেয়। কোলেস্টেরলের পঁচাত্তর শতাংশ আমাদের দেহেই তৈরি হয় আর বকি পঁচিশ শতাংশ কোলেস্টেরল ডিম, রেড মিট, দুধ ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের শরীরে ঢোকে।

কোলেস্টেরলের অভাবে কী হতে পারে

মানুষ তার প্রজনন ক্ষমতা হারাবে। লিভার তার হজম করানোর ক্ষমতা হারাবে। দেহের সমস্ত বিপাকীয় ক্ষমতা ভেঙে পড়বে। ভিটামিন-ডি তৈরিতে ঘাটতি পড়বে। হাড় ভঙ্গুর হবে। দেখা দেবে রিকেট, অস্টিওম্যালেশিয়া। দাঁত কমজোরি হবে। এক কথায় সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকাটাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

কোলেস্টেরল কী কাজে লাগে

বহু কাজে লাগে কোলেস্টেরল। যেমন—

- সেল মেমব্রেন অর্থাৎ কোষের বাইরের আবরণ তৈরি করে।
- স্টেরয়ডোজনিক হরমোন, যেমন টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন, অ্যান্ড্রোজেন, সেক্সুয়াল হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে কোলেস্টেরল।
- অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন হরমোন যেমন কর্টিজল, কর্টিকোস্টেরন, অ্যালডোস্টোরেন হরমোন তৈরিতে কাজে লাগে কোলেস্টেরল।
- লিভারে বিভিন্ন বাইল তৈরির জরুরি উপাদান হল কোলেস্টেরল।
- সূর্যালোক থেকে ত্বকে ভিটামিন-ডি সংশ্লেষ করতে জরুরি কোলেস্টেরল।
- ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে জাতীয় ভিটামিনগুলোর মেটাবলিজমে সাহায্য করে।
- নার্ভ ফাইবারগুলোকে রক্ষা করে কোলেস্টেরল।
- রক্তের মাধ্যমে কোলেস্টেরল সারা শরীরে বয়ে যায়। কোষ, গ্রন্থিগুলো সেখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে।

রক্তে স্বাভাবিক কোলেস্টেরলের মাত্রা কত হওয়া উচিত

একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের প্রতি ডেসি লিটার রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক মাত্রা ১৫০ থেকে ২৫০ মিগ্রার মধ্যে হওয়া উচিত।

হাই কোলেস্টেরল প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ২৪০ মিলিগ্রামের ওপরে। কোলেস্টেরল বেশি হওয়ার কারণে নানা বিপত্তি ঘটতে পারে। অতিরিক্ত কোলেস্টেরল রক্তনালীর মধ্যে জমে গিয়ে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়, রক্তনালীর গহ্বর সরু হয়ে যায়, এই অবস্থাটাকে বলে অ্যাথেরোস্কেলেরোসিস। এর ফলে রক্তনালীর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। রক্তনালী ছিঁড়ে রক্তপাত হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। যেমন সেরিব্রাল হেমারেজ।

চর্বি ও কোলেস্টেরল

দেহে কোলেস্টেরল বাড়া-কমা ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের ওপর নির্ভর করে। এই ফ্যাট দু'ভাবে মেলে, যেমন প্রাণীজ ফ্যাট অর্থাৎ ঘি, মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি। এগুলোতে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড কম থাকে। পর্যাপ্ত থাকে ভিটামিন-এ, ডি ও ক্যালসিয়াম। আর একটি হল উদ্ভিজ্জ ফ্যাট অর্থাৎ সর্ষে, বাদাম, জলপাই, তিল, সূর্যমুখী তেল, নারকেল তেল ইত্যাদি। এক কথায় সব ভোজ্য তেলই উদ্ভিজ্জ। যা প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের জন্য প্রাণীজ ফ্যাট থেকে উন্নতমানের। শারীরিক পুষ্টিতে ফ্যাট অবশ্যই খাওয়া উচিত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুসারে দৈনিক যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন আমাদের শরীরে তার ১৫-৩০ শতাংশ আসে ফ্যাট জাতীয় খাদ্য থেকে। আমরা খানিকটা ফ্যাট শাকসবজি ও ফলমূল থেকে পাই, বাকিটা তেল, ঘি, মাখন থেকে আসে।

অতিরিক্ত ফ্যাট দেহের ক্ষতি করে। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত তেল চর্বি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। যার ফলে রক্তনালীতে স্তর জমে। রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়।

রক্তনালী শীর্ণ হয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। রক্তনালীর নানা অসুখ ও হৃদরোগ দেখা দেয়। অতিরিক্ত ফ্যাট থেকে দেহের ওজন বাড়ে, হার্ট ও ব্লাডপ্রেসার জনিত নানা রোগ দেখা দিতে পারে।

তেল ও কোলেস্টেরল

তেল খেলে কি কোলেস্টেরল বাড়ে? শুধুমাত্র তেল খেলে কোলেস্টেরল বাড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, যদি না রোজ আমরা যা খাই তাতে কোলেস্টেরল থাকে। আসলে কোনো তেলেই কোলেস্টেরল নেই। কিন্তু শুধু তেল খেয়ে তো বাঁচা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে অন্যান্য খাবার খেতেই হবে। আর এর থেকেই শরীরে কোলেস্টেরল ঢুকে পড়ে। আমাদের স্মল ইনটেস্টিন থেকে ভোজ্য তেল কোলেস্টেরল শোষণ সাহায্য করে আর এভাবেই রক্তে বাড়ে কোলেস্টেরলের মাত্রা। তেল শুধু পরোক্ষ ভূমিকাটুকুই পালন করে।

বাড়তি কোলেস্টেরল কোন কোন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়

কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়, পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ এবং স্ট্রোকের আশঙ্কা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল মহিলাদের ক্ষেত্রে কখন সমস্যা তৈরি করে

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। মেনোপজ হবার আগে শরীরের ইস্ট্রোজেন এল.ডি.এল কমিয়ে দেয়, হার্টকে রক্ষা করে। মেনোপজের পরে ইস্ট্রোজেনের সুরক্ষা আর থাকে না। এল.ডি.এল বেড়ে যায়। বাড়ে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা।

কোলেস্টেরল, হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোক

হার্টে রক্ত সঞ্চালন যে সব রক্তনালী থেকে হয়, তাদের বলে করোনারি আর্টারি। কোনো কারণে এই আর্টারি বা ধমনীগুলোর কোনো অংশ ব্লকড হয়ে গেলে হার্টের রক্ত সঞ্চালনে বাধা পায়, কোলেস্টেরল এই বাধার সৃষ্টি করে। ব্লকিং বেশি হয় বাম করোনারি ধমনীর শাখা-প্রশাখায়। প্রধান বাম করোনারি ধমনী ব্লকড হলে হঠাৎ মৃত্যুও হতে পারে।

কোলেস্টেরলের সাথে কারো ডায়াবেটিস থাকলে তাদের ঝুঁকির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। কাজেই ডায়াবেটিস রোগীদের একটু বেশি সাবধান হতে হবে। ডায়াবেটিস থাকলে ও কোলেস্টেরল লেভেল বেশি থাকলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনির সমস্যা, পেরিফেরাল আর্টিয়াল ডিজিজ বেশি হতে দেখা যায়।

তেমনি এই সমস্যা যদি ব্রেনেরে ভেসেলে হয়, তাহলে ইসকেমিক স্ট্রোক বা ব্রেন স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে আরেক ধরনের স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় হেমারেজিক স্ট্রোক বলা হয়ে থাকে। হেমারেজিক স্ট্রোলে ব্লাডভেসেল ফেটে ব্রেন টিস্যুর মধ্যে রক্ত ছড়িয়ে যায়।

কোলেস্টেরল বেশি থাকলে কীভাবে ডায়াবেটিস মেলিটাস সমস্যা তৈরি করে

কোলেস্টেরলের সাথে কারো ডায়াবেটিস থাকলে তাদের ঝুঁকির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। কাজেই ডায়াবেটিস রোগীদের একটু বেশি সাবধান হতে হবে।

ডায়াবেটিস থাকলে ও কোলেস্টেরল লেভেল বেশি থাকলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনির সমস্যা, পেরিফেরাল আর্টিয়াল ডিজিজ বেশি হতে দেখা যায়।

ডায়াবেটিস থাকলে শরীরে এক বিশেষ ধরনের কোলেস্টেরল মেটাবলিজমে পরিবর্তন হয়। একে বলে ডায়াবেটিক ডিসলিপিডিমিয়া। এক্ষেত্রে ট্রাই-গ্লিসারাইড বেশি বেড়ে যায় আর এইচ.ডি.এল বা ভালো কোলেস্টেরল কমে যায়। ডায়াবেটিক ডিসলিপিডেমিয়া দেখা দিলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায় আর সেই সঙ্গে শরীরের বড় ধমনীগুলোতে কোলেস্টেরল জমে যায় ধীরে ধীরে। এটা শরীরের সবক'টা ধমনীতেই হতে পারে, যার ফলে পায়ে ঘা, অ্যাম্পুটেশন, হার্ট অ্যাটাক সবই হতে পারে।

কোন বয়সের মানুষের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা হতে পারে

সব বয়সের মানুষের মধ্যেই এই অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। তবে সাধারণত ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়।

রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ার লক্ষণ

রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ার কোনো বাহ্যিক লক্ষণ সাধারণত থাকে না। তবে জটিল কিছু ক্ষেত্রে ত্বকে বা পেশিতে ফ্যাট জমা হতে দেখা যায়।

কোন বয়সে কোলেস্টেরল টেস্ট করানো দরকার

কুড়ি বছরের ওপর হলেই প্রতি পাঁচ বছরে একবার কোলেস্টেরল চেক করে নেওয়া উচিত। চল্লিশ বছর বয়সের পর প্রতি বছর চেক করতে হবে। কোলেস্টেরলের অবস্থা জানতে থাইরয়েড ও লিপিড প্রোফাইল টেস্ট করা দরকার। ১২ ঘণ্টা খালি পেটে থেকে টেস্ট করতে হবে।

বিপত্তি এড়াতে কী সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন

• কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিদিন ত্রিশ মিনিট অ্যারোবিক্স করতে পারেন। অথবা ত্রিশ মিনিটে জোর হাঁটুন। মদ খাওয়া যাবে না, ধূমপান করা চলবে না কোনোভাবেই। লক্ষ রাখতে হবে রক্তে যেন কোলেস্টেরলের মাত্রা ১০০ থেকে ২০০ মি.মি-র মধ্যে থাকে।

• তামাকজনিত কোনো নেশা যেমন দোক্তা, জর্দা, গুড়াখু, পানমশলা কিছুই খাওয়া চলবে না।

• ফ্যাটসমৃদ্ধ খাবার নিশ্চয়ই খাবেন,তবে কম খাবেন। তেল খাবেন মিলিয়ে মিশিয়ে।

• মাছের তেল রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। চল্লিশ বছর বয়সের পর ঘি, মাখন, ডিমের হলুদ অংশ, মাংসের চর্বি ও মেটে, বনস্পতি কম খাবেন।

• যাদের রক্তে কোলেস্টেরল বেড়েছে তারা ভুলেও ওপরের খাবারগুলো খাবেন না।

• মাঝে মাঝে রক্তে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, এইচ.ডি.এল, এল.ডি.এল-এর মাত্রাগুলো পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। এদের একসঙ্গে বলে লিপিড প্রোফাইল।

যাদের দেহে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ২২০ মিলিগ্রাম বা তার ওপরে তাদের ক্ষেত্রে প্রাণীজ ফ্যাট অর্থাৎ মাংস, ডিম, চর্বি, মাখন খাওয়া একেবারে বারণ। যেটুকু ফ্যাট শরীরের প্রয়োজন তা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকেই মেটাতে হবে। আর প্রাণীজ প্রোটিনের মধ্যে কেবল মাছ চলতে পারে। তবে হ্যাঁ, সেই মাছ যেন বেশি তেল-চর্বিযুক্ত না হয়। কাজেই বেশি ওজনের ও পাকা মাছ খাওয়া চলবে না।

অহেতুক কোলেস্টেরল-ভীতির কোনো প্রয়োজন নেই। এই ভীতির কারণে ছোটদের ঘি, দুধ, ডিম, মাখন থেকে বঞ্চিত করে লাভ নেই। শরীর গঠন, প্রজনন এবং বিপাকের জন্য কোলেস্টেরল চাই-ই-চাই। যাদের রক্তে এটা বেশি আছে সতর্ক হবেন তারাই। তাছাড়া হার্ট অ্যাটাক বা সেরিব্রাল অ্যাটাকের জন্য শুধুমাত্র কোলেস্টেরল যে দায়ী তা নয়, আরো অনেক কারণ থাকে এর পেছনে।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার বিধি

যাদের দেহে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ২২০ মিলিগ্রাম বা তার ওপরে তাদের ক্ষেত্রে প্রাণীজ ফ্যাট অর্থাৎ মাংস, ডিম, চর্বি, মাখন খাওয়া একেবারে বারণ। যেটুকু ফ্যাট শরীরের প্রয়োজন তা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকেই মেটাতে হবে। আর প্রাণীজ প্রোটিনের মধ্যে কেবল মাছ চলতে পারে। তবে হ্যাঁ, সেই মাছ যেন বেশি তেল-চর্বিযুক্ত না হয়। কাজেই বেশি ওজনের ও পাকা মাছ খাওয়া চলবে না।

চুনোমাছ কিংবা চারা মাছ বা ছোট মাছ খেতে পারলে সবচেয়ে ভালো। যাদের কোলেস্টেরল বেশি, আবার ডায়াবেটিসেও ভুগছেন, তারা চিনি বা গুড় একদম খাবেন না। ভাত খাবেন মেপে। সারাদিনে এক কাপের মতো। আলুও দিনে একটির বেশি নয়। ফলের মধ্যে কলা, আম, আঙুর বাদ দিন। শশা, পেয়ারা, কোয়াসুদ্ধ লেবু এগুলো বেশি করে খান।

যাদের কোলেস্টেরল বেশি তারা পাতে নুন খাবেন না। কোলেস্টেরলের পরিমাণ আপাতত ঠিকঠাক থাকলেও আগামী দিনে যে এটা বেশি হবে না তা কিন্তু বলা সম্ভব নয়। চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে আমাদের সবার একটি ব্যালেন্সড ডায়েট মেনে চলাই স্বাস্থ্যকর এবং বাঞ্ছনীয়। ❑

অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য ডায়েট বা শরীরচর্চার পাশাপাশি এখন সবচেয়ে ভালো উপায় বেরিয়াট্রিক সার্জারি। এতে পেটে খাবার যেখানে সঞ্চয় হয়, সেই অংশটাকে একটু কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে গ্লুকোজ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ দুই–ই খুব ভালো হয়। এর সঙ্গে রক্তচাপ, রক্তের লিপিড় এগুলোও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কীভাবে কমাবেন

ডাঃ অমিতাভ সুর

এম ডি (জেনারেল মেডিসিন), ডি এম (এন্ডোক্রিনোলজিস্ট)

কনসালট্যান্ট ডায়াবেটোলজি অ্যান্ড এন্ডোক্রিনোলজিস্ট

মোবাইল : ৯৬৭৪৮৫৬৮৯২

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বা প্রতিরোধে দরকার নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতি বা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। এই নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন পদ্ধতির দুটো দিক—(১) ডায়েট বা নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্ট এবং (২) এক্সারসাইজ বা শরীরচর্চা। চলুন জেনে নিই ব্যাপারটা ঠিক কী।

ওজন নিয়ন্ত্রণে ডায়েট

শরীরের সুস্থতা বজায় রাখার পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণেও ডায়েটের ভূমিকা রয়েছে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওজন নিয়ন্ত্রণ। পারিবারিক ইতিহাস, হাইপারটেনশন, কোলেস্টেরল, ট্রান্স ফ্যাট বেশি খাওয়া ইত্যাদি বেশ কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকলেও ডায়াবেটিসে প্রধান রিস্ক ফ্যাক্টর ওবেসিটি বা অতিরিক্ত ওজন। আমাদের শরীরের ওজন কম না বেশি তার পরিমাপের একক বডিমাস ইনডেক্স বা বি এম আই। বি এম আই ২৩–এর ওপর থাকলে সেটাকে বলে অতিরিক্ত ওজন। ২৫–এর ওপর হলে তা ওবেসিটি। এই অতিরিক্ত ওজন বা ওভার ওয়েট হল ডায়াবেটিসের সবচেয়ে বড় রিস্ক ফ্যাক্টর।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে কমানোর জন্য দরকার নিয়ন্ত্রিত ওজন বা ওজন বেশি থাকলে তা কমানো। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ওজন বেশি থাকলে তা ৫–৭ শতাংশ কমানো দরকার। এটা করতে পারলে যাঁদের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তাঁদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

যাঁরা ডায়াবেটিসের সঙ্গে ওবেসিটিতেও আক্রান্ত তাঁদেরও ৫–৭ শতাংশ ওজন কমানো দরকার। এতে শুধু ডায়াবেটিসই নয়, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল বা লিপিড নিয়ন্ত্রণে আনাও সম্ভব। সুতরাং, ওজন কমানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কেমন হবে প্রতিদিনকার ডায়েট?

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের খাদ্য তালিকায় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, কিছু পরিমাণ ভিটামিন, মিনারেলস সবই থাকে। কার খাবারে কতটা প্রোটিন, কতটা কার্বোহাইড্রেট, কতটা ফ্যাট থাকবে সেটা নির্ভর করে ব্যক্তির জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শরীরে ক্যালরির শোষণ। ওবেসিটিতে আক্রান্ত হলে শরীরে ক্যালরি শোষণের পরিমাণ কমানো দরকার। এই কমানোটা নির্ভর করে জীবনযাপন পদ্ধতি কেমন তার ওপর। তিনি কি অফিসে কর্মরত না খুব বেশি কায়িক পরিশ্রম করেন?

ওজন কমানোর জন্য প্রথমেই দরকার আমাদের প্রতিদিনকার খাবার থেকে যেন শরীরে ১২০০-র বেশি ক্যালরি না ঢোকে। যদি ১২০০ ক্যালরির কম রাখা যায় তাহলেই ওজন কমানো সম্ভব।

তবে বাচ্চা বা প্রেগনেন্ট মহিলাদের ক্ষেত্রে ক্যালরি শোষণের পরিমাণ এভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ বাচ্চার বিকাশের সময় ক্যালরির চাহিদা বেশি থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে পেডিয়াট্রিশিয়ান বা এন্ডোক্রিনোলজিস্টের পরামর্শমতো চলুন। আর প্রেগনেন্ট মহিলাদের ওজন কমানোর কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয় না। তাঁদের ক্ষেত্রে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রেগনেন্সির সময় ডায়েটে ১৮০০-২২০০ ক্যালরি থাকতেই পারে। তবে এটা নির্ভর করবে প্রেগনেন্ট মহিলার বি এম আই-এর ওপর।

আমাদের শরীরে শোষণ হওয়া মোট ক্যালরির ২০ শতাংশ আসে প্রোটিন থেকে। এমনকী ফ্যাট থেকেও আসতে পারে ২০ শতাংশ। ফ্যাট অনেক ধরনের। যেমন, স্যাচুরেটেড ফ্যাট। যেটা সাধারণত রেড মিট, ঘি, মাখন ইত্যাদিতে থাকে। এই স্যাচুরেটেড ফ্যাট যত কম শরীরে ঢোকে ততই ভালো। একজন মানুষের শরীর সারাদিন যে পরিমাণ ক্যালরি শোষণ করে তার ৭ শতাংশের বেশি স্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকে আসা উচিত নয়। বরং কম হলে ভালো। বাকি ১২-১৪ শতাংশ পলি (সানফ্লাওয়ার অয়েলে বেশি থাকে) আর মোনো (রাইসব্যান, অলিভ, ক্যানুলা অয়েল ইত্যাদিতে থাকে) আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকে আসার কথা। সুতরাং সব তেলই পরিমিত পরিমাণে রান্নায় ব্যবহার করা উচিত, যাতে সব তেলের ভালো গুণগুলো শরীরে প্রবেশ করে।

৭ শতাংশ, ২০ শতাংশ এত শতাংশের হিসাব একজন সাধারণ মানুষ বুঝবে কী করে?

এর একটা সহজ হিসাব হল, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতি মাসে ৫০০ গ্রামের বেশি তেল খাওয়া উচিত নয়। বাচ্চা-সহ তিনজনের পরিবার হলে ১ লিটার (সানফ্লাওয়ার, সরষের তেল ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে) তেলের বেশি খরচ হওয়া উচিত নয়। ১.৫ লিটার হলে বুঝতে হবে তেলের খরচ বেশি হচ্ছে। যাঁর ডায়াবেটিস নেই তাঁর জন্য বেশি তেল হয়তো খুব একটা ক্ষতি করছে না, কিন্তু যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে ওই বেশি পরিমাণ তেলটা কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং দু'জনেরই কম তেল খাওয়া উচিত, যাতে যাঁর ডায়াবেটিস হয়নি তিনিও ভালো থাকেন আর যিনি ইতিমধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাঁরও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ওজন কমানোর জন্য প্রথমেই দরকার আমাদের প্রতিদিনকার খাবার থেকে যেন শরীরে ১২০০-র বেশি ক্যালরি না ঢোকে। যদি ১২০০ ক্যালরির কম রাখা যায় তাহলেই ওজন কমানো সম্ভব।

ডায়াবেটিস হলে চিনি খাওয়া একেবারেই বন্ধ?

চিনি অর্থাৎ সুক্রোজ একেবারে চলবে না, এমনটা কিন্তু নয়। সামান্য পরিমাণে চিনি খাওয়াই যায়। মোট ক্যালরির ১০ শতাংশের বেশি যেন চিনি থেকে না আসে। আপনাকে যদি চিকিৎসক ১২০০ ক্যালরি পর্যন্ত ক্যালরি শোষণের কথা বলেন, তাহলে চিনি থেকে উৎপন্ন ক্যালরি কোনওভাবেই ১২০-র বেশি হবে না। তাহলে সারাদিনে চা-চামচের এক চামচের মতো চিনি আপনি খেতেই পারেন। সেটা চা বা দই যাতে খুশি।

আর ভাত খাওয়া...

ভাতও খেতে পারেন। দু'ধরনের খাবার আছে — লো এবং হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড। লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খাবার যত খুশি খাওয়াই যায়। গ্লুকোজের তুলনায় অন্য কোনও খাবার কতটা সুগার বাড়াতে পারছে, সেটাকেই বলে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স। এই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যে খাবারে যতটা বেশি, সেই খাবার তত তাড়াতাড়ি রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়। যে খাবারে গ্লাইসেমিক

ইনডেক্স বেশি সেই খাবার মেপে খেতে হবে। যেমন রুটি, ভাত ইত্যাদি। আর যে খাবারে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেক কম সেই খাবার পরিমিত পরিমাণে খাওয়াই যায়। এগুলোকে সহজ ভাষায় 'ফ্রি ফুড' বলে। অর্থাৎ যে খাবার খাওয়ার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখার দরকার নেই। যেমন, আপেল, কমলালেবু, মোসাম্বি লেবু, তরমুজ, পেয়ারা, পেঁপে, সয়াবিন ইত্যাদি। তবে যদি কিডনির সমস্যা থাকে তাহলে প্রোটিন খাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে। ০.৪–০.৫ গ্রাম/শরীরের ওজন।

শরীরচর্চা

ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির একটা ধরন হল এক্সারসাইজ বা শরীরচর্চা। যেখানে নিয়ম মেনে ব্যায়াম করা হয়। শরীরচর্চার উদ্দেশ্য তিনটি —গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ, কার্ডিও রেসপিরেটরি ফিটনেস এবং অতিরিক্ত ওজন কমানো। এগুলো ছাড়াও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও শরীরচর্চার কিছুটা ভূমিকা রয়েছে।

শরীরচর্চা তিন ধরনের—(১) অ্যারোবিক এক্সারসাইজ। যেটা মূলত কার্ডিও রেসপিরেটরি ফিটনেসের জন্য। সেখানে পেশির সঞ্চালন ভালো হয়, ফলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। যেমন, হাঁটা, স্লো জগিং, সাইক্লিং ইত্যাদি। (২) অ্যানারোবিক এক্সাসাইজ। যেমন, খুব জোরে দৌড়নো বা জোরে সাইক্লিং ইত্যাদি। এতে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ খুব ভাল হয়। তবে এটা সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এটা মূলত অ্যাথলিটদের জন্য। এবং (৩) রেজিস্ট্যান্ট এক্সারসাইজ। যেমন, ওয়েটলিফটিং।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কীধরনের শরীরচর্চা?

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চার পরামর্শ দেওয়া হয়। যেটা বয়স বা ডায়াবেটিসের ধরনের ওপর নির্ভর করে।

● কিশোর বয়সে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে দরকার প্রতিদিন অন্তত ৬০ মিনিট ভিগোরাস এক্সারসাইজ। অর্থাৎ হাঁটা, দৌড়নো, জগিং, সাইক্লিং ইত্যাদি। এটা শুধু ডায়াবেটিসের জন্যই নয়, ওজন কমানোর জন্যও উপকারী।

● প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট শারীরিক কসরতের দরকার। যেমন হাঁটা, স্লো জগিং, স্লো সাইক্লিং ইত্যাদি। কেউ যদি সময়ের অভাবে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চার জন্য ব্যয় করতে না পারেন, তাহলে তিনি সপ্তাহে ৭৫ মিনিট হাইস্পিড এক্সারসাইজ করতে পারেন। যেমন, জোরে দৌড়নো, সাঁতার কাটা ইত্যাদি। এই ১৫০

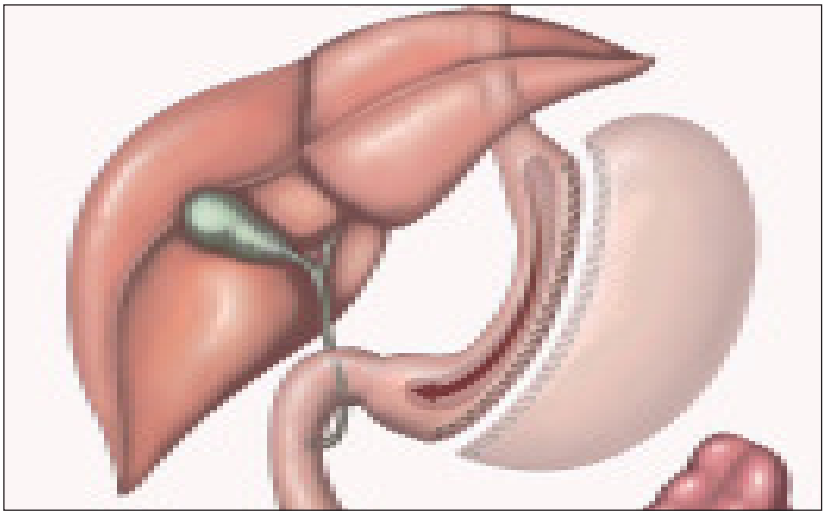

সামান্য পরিমাণে চিনি খাওয়াই যায়। মোট ক্যালরির ১০ শতাংশের বেশি যেন চিনি থেকে না আসে। আপনাকে যদি চিকিৎসক ১২০০ ক্যালরি পর্যন্ত ক্যালরি শোষণের কথা বলেন, তাহলে চিনি থেকে উৎপন্ন ক্যালরি কোনওভাবেই ১২০–র বেশি হবে না। তাহলে সারাদিনে চা–চামচের এক চামচের মতো চিনি আপনি খেতেই পারেন। সেটা চা বা দই যাতে খুশি।

বা ৭৫ মিনিটকে সপ্তাহে ৫ দিন বা কমপক্ষে ৩ দিনে ভাগ করে নিতে পারেন। কেউ একদিনে ১৫০ বা ৭৫ মিনিট শরীরচর্চা করতে যাবেন না বা দু'দিন পরপর শরীরচর্চা করলেন না, এটা করবেন না। এই ১৫০ বা ৭৫ মিনিট শরীরচর্চার পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের সপ্তাহে অন্তত দু'দিন রেজিস্ট্যান্ট এক্সারসাইজ করা উচিত। যেমন, ওয়েটলিফটিং ইত্যাদি।

● প্রেগনেন্ট মহিলারা শরীরচর্চার আগে অবশ্যই গাইনেকোলজিস্টের পরামর্শ নেবেন। প্রেগনেন্সির সময় সাধারণত খুব হালকা শরীরচর্চার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর সেটা প্রতিদিন ৩০ মিনিটের বেশি নয়।

ডায়েট বা শরীরচর্চায় কি অতিরিক্ত ওজনকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব?

সঠিক ডায়েট বা ঠিকমতো শরীরচর্চায় অতিরিক্ত ওজনের মাত্র ১০–১৫ শতাংশের মতো কমে। ওবেসিটি শুধু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায় না, ওবেসিটির কারণে করোনারি আর্টারি ডিজিজ, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, হাইপারটেনশন ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। সুতরাং ওজন নিয়ন্ত্রণ খুবই জরুরি। তাই অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য ডায়েট বা শরীরচর্চার পাশাপাশি এখন সবচেয়ে ভালো উপায় বেরিয়াট্রিক সার্জারি। এতে পেটে খাবার যেখানে সঞ্চয় হয়, সেই অংশটাকে একটু কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে গ্লুকোজ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ দুই–ই খুব ভালো হয়। এর সঙ্গে রক্তচাপ, রক্তের লিপিড় এগুলোও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। ডায়াবেটিস ও ওবেসিটিতে আক্রান্ত ১০ জনের যদি বেরিয়াট্রিক সার্জারি করা হয়, তাহলে সার্জারির ৬ বছর পর দেখা যাবে অন্তত ৬ জনের ডায়াবেটিস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। বেরিয়াট্রিক সার্জারি শুধু ওজনই কমায় না, জি এল পি–১ হরমোনের ক্ষরণ অনেকটাই বাড়ায়, ফলে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়। ❑

■■

নাড়ির গতি দ্রুত হয়, শ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, রোগী অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে। অনেক সময় অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। এইসব জটিলতার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

■■

বড় বিপজ্জনক
বয়স্কদের নিউমোনিয়া

ডাঃ অংশুমান মুখার্জি
(বিশিষ্ট বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ, আমরি হসপিটাল)
ফোন : ০৩৩-৬৬০৬ ৩৬০০

নিউমোনিয়া ফুসফুসের এক ধরনের প্রদাহ। যা সাধারণত ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সংক্রামিত হয়। নিউমোনিয়ার ফলে ফুসফুসের গঠনগত পরিবর্তন হয়ে কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। পরে অবশ্য সংক্রমণ কমে গেলে সাধারণত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে মাঝে-মধ্যে এই রোগটা অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে ওঠে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষণীয় ভাবে বেশি এবং মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। তাই বাড়িতে থাকা কোনো বয়স্ক মানুষের নিউমোনিয়া হলে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি।

নিউমোনিয়ার সংক্রামক জীবাণুগুলো কী কী

নিউমোনিয়া সাধারণত দু'রকমের হয়। প্রথমটি সাধারণ কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া।

বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা জাতীয় ভাইরাস প্রায়শই নিউমোনিয়া সংক্রমণ করে।

নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া অনেক সময় মারাত্মক হয়ে ওঠে।

আর এক ধরনের নিউমোনিয়া হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে ভর্তি থাকাকালীন অবস্থায় হতে পারে। এক্ষেত্রে স্টাফাইলোকক্কাস সিউডোমোনাস জাতীয় প্রভৃতি মারাত্মক জীবাণু বা কিছু ছত্রাক নিউমোনিয়ার কারণ হতে পরে। এসব ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার খুব বেশি।

প্রতি বছর নিউমোনিয়া বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন মানুষকে আক্রান্ত করে এবং প্রায় ৪ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু ঘটে প্রতি বছর। বিংশ শতাব্দীতে অ্যান্টিবায়োটিক ও ভ্যাকসিনের প্রবর্তনের ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিউমোনিয়া মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হিসেবে রয়ে গেছে।

লক্ষণ

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে এই রোগের লক্ষণগুলো খুব সুনির্দিষ্ট নাও হতে পারে।

সাধারণভাবে হঠাৎ করে জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট এই রোগের প্রারম্ভিক লক্ষণ। এর সঙ্গে হাত-পা, মাথার যন্ত্রণা থাকতে পারে। কিন্তু বার্ধক্যে এইসব লক্ষণ পুরোপুরি প্রকাশ পায় না। বৃদ্ধ মানুষ হঠাৎ হঠাৎ পড়ে যাচ্ছেন কিংবা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন অথবা ভুল বকছেন, রক্তচাপ কমে যাচ্ছে অথবা খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন কিন্তু নিউমোনিয়া রোগের কথা ভাবতে হবে রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী।

নাড়ির গতি দ্রুত হয়, শ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, রোগী অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে। অনেক সময় অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। এইসব জটিলতার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

নিউমোনিয়ার প্রারম্ভিক লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কী কী পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে

- রক্ত পরীক্ষা।
- বুকের ফটো বা ছবি।
- কফ পরীক্ষা।

বিশেষ ক্ষেত্রে আরো উন্নত পরীক্ষা যেমন সিটি স্ক্যান, বুকের ব্রঙ্কোস্কোপি, লাভাজ প্রভৃতি প্রয়োগ করে রোগীকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখে চিকিৎসা করতে হয়।

কতদিন থাকে

একসপ্তাহ থেকে কয়েক সপ্তাহ।

ঝুঁকির কারণ

সিস্টিক ফাইব্রোসিস, সিওপিডি, সিকল সেল ডিজিজ, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, হার্ট ফেলিওর, ধূমপানের ইতিহাস থাকলে নিউমোনিয়া রোগীর ঝুঁকি বাড়ে।

বার্ধক্যে নিউমোনিয়া এত বেশি হয় কেন

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্বাসনালীর ও ফুসফুসের গঠনগত এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যক্ষমতার কিছু বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন সুরক্ষাবলয় দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা কমতে থাকে।

শ্বাসনালীর সুরক্ষা বলয়ে যখন কোনোভাবে ফাটল ধরে যেমন কারো দাঁত বা মাড়ি যদি অস্বাস্থ্যকর থাকে তবে জীবাণুরা সেখানে বাসা বাঁধে এবং বক্তিটি যদি নেশাগ্রস্ত হন তাহলে ঘুমের ঘোরে শ্বাসনালীর মধ্যে এগুলো টেনে নেয় এবং অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষত ধূমপান ও মদ্যপানের ফলে এই সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া অত্যধিক অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ খেলে আমাদের খাদ্যনালী ও পাকস্থলির পাচক রসে জীবাণুর বাসা বাঁধতে সুবিধে হয় এবং

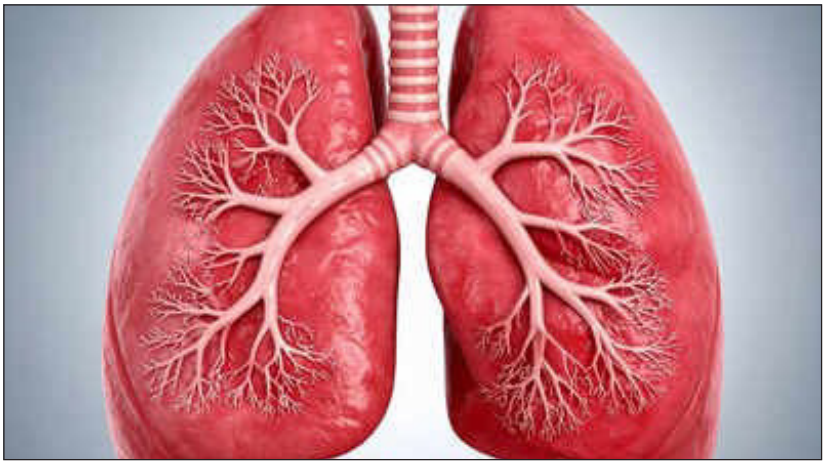

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্বাসনালীর ও ফুসফুসের গঠনগত এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যক্ষমতার কিছু বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন সুরক্ষাবলয় দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা কমতে থাকে।

অ্যাসপিরেশনের ফলে নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বয়স্ক মানুষদের ডায়াবেটিস, হাঁপানি রোগ, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। তাই সহজেই নিউমোনিয়া রোগে তারা আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

বৃদ্ধ মানুষরা অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় যাতয়াত করেন, বেড়াতে ভালোবাসেন। এরা নতুন পরিবেশে সহজেই নিউমোনিয়ার শিকার হয়ে পড়েন।

বার্ধক্যে হার্টের রোগ বা হার্ট ফেলিওর, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির ক্রনিক রোগ অনেকের একসঙ্গে থাকে, ফলে নিউমোনিয়া অনেক সময় মারাত্মক হয়ে পড়ে। এছাড়া যারা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ যেমন স্টেরয়েড প্রভৃতি খান, নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা তাদের বৃদ্ধি পায়।

প্রতিরোধক ব্যবস্থা

রোগ নিরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোগটির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- বয়স্ক মানুষদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিশেষত দাঁত, মাড়ি, সাইনাস প্রভৃতির বিশেষ যত্ন নিতে হবে।
- অত্যধিক অ্যান্টাসিড ও ঘুমের ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- যারা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা জাতীয় হাঁপানির রোগ বা সিওপিডি প্রভৃতি রোগে ভোগেন তাদের বছরের কিছু সময় বিশেষ করে শীতকালে সতর্কতা গ্রহণ প্রয়োজন।
- অত্যধিক গরম থেকে এসি রুমে বা এসি রুম থেকে গরমে যাওয়া বন্ধ করতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিক গ্রুপের ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। এতে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স জীবাণু বিশেষত নিউমোকক্কাল বৃদ্ধির আশঙ্কা বেড়ে যায়।
- প্রতিষেধক হিসেবে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্রতি বছর নিলে ভাইরাস ঘটিত নিউমোনিয়ার প্রকোপ কিছুটা কমে।

নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন ৬৫ বছরের উর্ধ্বে একবার নিয়ে নেওয়া উচিত। কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পরে আর একবার নেওয়া যেতে পারে।

দু'রকমের ভ্যাকসিন একসঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য দু'হাতে ডেল্টয়েড মাসলে। সাধারণত শীতকালের শুরুতে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে এই ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া যেতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে বয়সজনিত কারণে ভ্যাকসিনের প্রতিরোধ ক্ষমতা আশানুরূপ নাও হতে পারে। ❑

অনুলিখন : শ্যামলী গঙ্গোপাধ্যায়

রজঃনিবৃত্তির পর হরমোন চিকিৎসা

ডা. সবুজ সেনগুপ্ত
(স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, মেডিকা সুপার স্পেশালিটি)
মোবাইল : ৯৪৩৪০০৯৭২৯

রজঃনিবৃত্তি শব্দটা খটোমটো শোনালেও মেনোপজ বললে সবাই তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবেন। গুগুল্ বাবার কল্যাণে সবাই এত জ্ঞানী হয়ে গেছে আজকাল যে কিছু বলতেও ভয় করে। ডাক্তারবাবু, আমার তো মেনোপজ হয়ে গেছে, এবার কি এইচ.আর.টি চালু করবেন? এরকম প্রশ্ন তো প্রায়শই শুনতে পাই।

চল্লিশোর্ধ ভদ্রমহিলা হঠাৎ কয়েকমাস রজস্রাব না হলেই ধরে নেন মেনাপজ হয়ে গেছে। অন্তত এক বছর বন্ধ না থাকলে চিকিৎসক মানতেই চাইবেন না যে মেনোপজ হয়েছে। তবে নিজেই সব কিছু ভেবে না নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া অবশ্যই জরুরি।

মেনোপজ হলেও সবার যে হরমোন চিকিৎসা দরকার পড়বে তা কিন্তু নয়। এই রজঃ–নিবৃত্তি হয় শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের ঘাটতি হলে। চিকিৎসা সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করে যে এই রজঃনিবৃত্তির জন্যে কতটা অসুবিধের মধ্যে রোগিণীকে পড়তে হচ্ছে। অসুবিধেগুলোর মধ্যে এগুলোর কথা বলা যেতেই পারে :

- হঠাৎ হঠাৎ গরম বোধ হওয়া।
- রাত্তিরে প্রচন্ড ঘাম হওয়া।
- যোনিদ্বারে চুলকানি এবং জ্বালাভাব।
- হঠাৎ হঠাৎ মুড পরিবর্তন।
- অনিদ্রা।
- চুল পড়ে যাওয়া।
- প্রস্রাবের কষ্ট।

আচ্ছা, কী কী লক্ষণ থাকলে আপনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন ?

■**যৌন উত্তেজনার অভাব** : রজঃনিবৃত্তি প্রায়ই এনে দেয় যৌনদ্বারে শুষ্ক ভাব এবং যোনিপথের দেওয়াল খুব পাতলা হয়ে যায়। এগুলো চিকিৎসককে খোলাখুলি বলতে রোগিণীরা একটু দ্বিধা বোধ তো করেনই। কিন্তু এগুলো সবই

চিকিৎসকের জানা দরকার।

■**যোনিদ্বারে চুলকানি এবং জালা ভাব** : ইস্ট্রোজেনের অভাব যোনিদ্বারে যে শুষ্কতা এনে দেয় তার জন্য চুলকানি এবং জ্বালা হতে পারে। এছাড়া ছত্রাক সংক্রমণ খুব সহজেই আক্রমণ করে নারীদেহের এই অংশকে।

■**রাত্রিতে প্রচন্ড ঘাম হওয়া** : এটাও হয়ে থাকে ইস্ট্রোজেনের অভাবে। আসলে ইস্ট্রোজেনের কল্যাণে শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কন্ট্রোলে থাকে।

■**ক্ষণে ক্ষণে মুডের পরিবর্তন** : একটু আধটু মুড পরিবর্তন হতে পারে। সুষম খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, যোগব্যায়াম কাউকে কাউকে একটু সাহায্য করলেও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

■**অনিদ্রা** : রজঃনিবৃত্তির পর এটা একটা বড় সমস্যা।

■**হঠাৎ হঠাৎ গরম লাগা** : ইস্ট্রোজেনের ঘাটতি হবার দরুন মস্তিষ্কে হাইপোথ্যালামাস আক্রান্ত হয়। তার জন্য হঠাৎ হঠাৎ এই গরম লাগা।

■**চুল পড়ে যাওয়া।**

■**প্রস্রাবে অসুবিধে** : হঠাৎ হাঁচি–কাশিতে প্রস্রাব বেরিয়ে যাওয়া, প্রস্রাবে সংক্রমণ ইত্যাদি।

হরমোন থেরাপি সবার জন্য নয়। বিশেষ করে এদের জন্য তো নয়ই—

- যার স্তন ক্যানসারের ইতিহাস আছে।
- যার ওভারিয়ান ক্যানসার আছে।
- যার জরায়ুতে ক্যানসার আছে।

হরমোন থেরাপি কি খারাপ? এই প্রশ্নও

চিকিৎসককে প্রায়ই শুনতে হয়। এটার উত্তর হচ্ছে, হরমোন থেরাপির অনেক ভালো দিকও আছে কিন্তু।

যদিও একেবারে রিস্ক-ফ্রি একে বলা যাবে না কিন্তু হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি রজঃনিবৃত্তির যে কষ্টকর ব্যাপারগুলো আছে তার থেকে মুক্তি দেয়। আর হাড়ের ভঙ্গুরতা থেকে অনেকটাই রেহাই দেয়। হার্টের কোনো দুর্বলতা থাকলে তার থেকেও বাঁচায়।

কোন বয়সে হরমোন থেরাপি শুরু করা উচিত? ৬০ বছর বয়সের আগেই যদি শুরু করা হয় বা মেনোপজ হবার ১০ বছরের মধ্যে শুরু করা হয় তবে অনেকাংশেই ঝুঁকির মাত্রা অনেক কমে গিয়ে ভালোর দিকটাই বেশি হয়ে থাকে।

লাগাতার ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন কোনো দিন বাদ না দিয়ে মেনোপজের পর থেকে রোজ খেলে অনেক সুবিধে তো পাওয়া যায়ই বরং ঝুঁকিও কম থাকে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথাও অনেকেই জিজ্ঞেস করে। হ্যাঁ, তা তো আছেই। শুরু করার পর রজঃস্রাব, স্তনে ব্যথা ভাব, বমি ভাব এবং মুডের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন।

সবচাইতে বেশি ঝুঁকির কথা যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তো বলতে হয়, স্তন ক্যানসারের কথা, ওভারিয়ান ক্যানসার এবং জরায়ুর ক্যানসার। তবে বার বার বলছি এই ঝুঁকিগুলো খুবই সামান্য কয়েকজনের মধ্যে দেখা যায়।

ঝুঁকির মধ্যে বলতে গেলে বলতে হয়—

●ডিপ ভেনাস থ্রম্বোসিস : রক্ত জমে গিয়ে (পায়ে বা লাংসে) সেরিব্রাল স্ট্রোক হতে পারে। বা কখনও হার্ট অ্যাটাক।

● গলব্লাডার ডিজিজ বা গলস্টোনের (পিত্তনালীতে পাথর) সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

● মধ্যবয়সের পর হরমোন চিকিৎসা শুরু করলে ডিমেনসিয়া (ভুলে যাওয়ার অসুখ) বা অ্যালজাইমার্স ডিজিজ হতে পারে।

●যদি হিস্ট্রেকটমি করা না হয়ে থাকে আর থেরাপিতে প্রোজেস্টেরন না থাকে, শুধু ইস্ট্রোজেনে এনডোমেট্রিয়াল ক্যানসারের সম্ভাবনা থাকে। কারণ শুধু ইস্ট্রোজেন জরায়ুতে এন্ডোমেট্রিয়াল লাইনিংটা বাড়িয়ে দেবে।

হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া—

●স্পটিং, একটু একটু স্রাব হওয়া।

একেবারে রিস্ক-ফ্রি একে বলা যাবে না কিন্তু হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি রজঃনিবৃত্তির যে কষ্টকর ব্যাপারগুলো আছে তার থেকে মুক্তি দেয়। আর হাড়ের ভঙ্গুরতা থেকে অনেকটাই রেহাই দেয়। হার্টের কোনো দুর্বলতা থাকলে তার থেকেও বাঁচায়।

●মাথাব্যথা।

●স্তনে ব্যথা।

●গা বমি বমি ভাব।

●একটু শরীরটা ভারী হয়ে যাওয়া।

এতক্ষণ অনেক গল্প তো হল। এবার আবার শুরুতেই ফিরে যাই। এতক্ষণে সবাই বুঝে গেছেন এই দুটো মেয়েলি হরমোনের অভাবেই যত বিপত্তি। আর স্বাভাবিক ভাবেই বয়েস হবার সাথে সাথে এগুলো রক্তে কমে আসে বা কোনো কারণে জরায়ু বা ওভারি বাদ চলে গেলে (শল্য চিকিৎসায়)। এই ইস্ট্রোজেনের কী কাজ শরীরে—

●জরায়ুর দেয়ালের লাইনিং তৈরি করা।

●ক্যালসিয়াম যা হাড়ের ভঙ্গুরতা রোধ করে সেটা শরীরে কীভাবে ব্যবহার হবে।

●রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখা।

●যোনিপথ সুস্থ রাখা।

●হাড়ের ভঙ্গুরতা রোধ করা।

আর আরো একটা মেয়েলি হরমোন প্রোজেস্টেরন। সেটারই বা কী কাজ, কারণ বয়সের সাথে সাথে সেটাও কমে আসে—

●প্রধান কাজ গর্ভে সন্তানকে সুস্থ রাখা।

●রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা।

●নিদ্রা এবং মুডকে কন্ট্রোল করা।

এখন মেনোপজ হয়ে গেলে এই দুই হরমোনই রক্তে কমে আসে। তখন শরীরে যা যা কষ্ট হয় সেগুলো আগেই বলা হয়েছে। হরমোন থেরাপি হচ্ছে এই হরমোনের মাত্রা শরীরে আবার বাড়িয়ে দেওয়া যাতে এই কষ্টগুলো লাঘব হয়—

●ইস্ট্রোজেন থেরাপিতে চিকিৎসকরা খুব কম মাত্রায় এই ইস্ট্রোজেন দিয়ে কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করে থাকেন। সাধারণত পিল বা বড়ি হিসেবে এটা দেওয়া হয়। প্রতিদিন খেতে হবে। বড়ি ছাড়াও ক্রীম, ভ্যাজাইনাল রিং, জেল বা স্প্রে হিসেবেও দেওয়া হয়।

●ইস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরন থেরাপি। এটাকে কম্পিনেশন থেরাপিও বলা হয়। যাদের জরায়ু বর্তমান তাদের শুধু ইস্ট্রোজেন দিলে এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসারের সম্ভাবনা বেড়ে যায় কারণ এই এন্ডোমেট্রিয়ালতো মাসে মাসে ঝরে পড়ছে না, তাই এই সেলগুলো ইস্ট্রোজেনের কল্যাণে বেশি বেশি করে মাত্রাছাড়া ভাবে বাড়তে থাকে। প্রোজেস্টেরন এই ঝুঁকিটাই কমিয়ে দেয়।

আর যাদের জরায়ু নেই (শল্য চিকিৎসায় বাদ পড়ে গেছে) তখন কম্বিনেশন থেরাপি বা প্রোজেস্টেরনের দরকার পড়ে না। শুধু ইস্ট্রোজেন ব্যবহার করলেই চলে যেটার কয়েক দিন ব্যবহার করলেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি কম।

অনেকেই জানতে চান কোনো প্রাকৃতিক উপায়ে মেনোপজের কষ্টগুলো লাঘব করা যায় কি না।

জাপানীরা নাকি মেনোপজ বলে যে একটা ব্যাপার আছে তা জানেই না। জাপানী মহিলারা কেউই এসব কষ্ট নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যান না। এর কারণ হচ্ছে জাপানীরা প্রচুর সয়াবিন বা সয়াপ্রোটিন খায়। এই সয়াবিনে প্রচুর ইস্ট্রোজেন আছে (ফাইটো ইস্ট্রোজেন)। আইসোফ্লাবিন এই ফাইটো ইস্ট্রোজেনের প্রধান উপাদান যা সয়াবিনে আছে।

তাছাড়া ডার্ক চকোলেট, রসুন তেল, ভিটামিন-ডি ইত্যাদিতেও আছে ইস্ট্রোজেন সাপ্লাই দেবার উপাদান। ডিম এবং দুধ-ও কিন্তু ইস্ট্রোজেনের ভালো যোগানদার।

সুষম খাবার হিসেবে ফাইটোইস্ট্রোজেন থাকা খাবার, ব্যায়াম, চিন্তামুক্ত জীবন, শান্তির নিদ্রা এগুলো অনেকটাই লাঘব করতে পারে রজঃ-নিবৃত্তির পরের কষ্টসমূহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কষ্টের বাড়াবাড়ি হয় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। তিনিই সব পরীক্ষার শেষে যদি দরকার হয় তবে হরমোন চিকিৎসার পরামর্শ দেবেন। ❑

কীভাবে আপনার ক্যারিয়ার রক্ষা করবেন

ডাঃ অঞ্জন ভট্টাচার্য
(শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ)
মোবাইল : ৯৮৩০০৩২৯৬৮

শুভশ্রী ভট্টাচার্য
(ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট)

আজকের সময়ে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং শিক্ষার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যক্তিদের তাদের পড়াশোনা, পেশার পছন্দ এবং ভবিষ্যতের কর্মজীবন সম্পর্কে ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

কিন্তু এর পরও অনেক মানুষ ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। এটি কাদের জন্য, কখন করা উচিত এবং এর বিশেষত্ব কী—এসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তাদের নেই। পাশাপাশি ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের উপকারিতা সম্পর্কেও বেশিরভাগ মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

বিজ্ঞানীদের মতে, পরিকল্পিত ক্যারিয়ার নির্বাচন প্রক্রিয়া কৈশোরকাল থেকে শুরু করা উচিত, অর্থাৎ প্রায় ক্লাস ৮ থেকে। এই সময়ে যদি শিশুর জন্মগত দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়, তাহলে তাদের ক্ষমতাগুলোকে সবচেয়ে ভালোভাবে বিকাশ ঘটানো ও কাজে লাগানো সম্ভব।

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং মূল্যায়ন ব্যক্তির যোগ্যতা (ability), আগ্রহ (interest), ব্যক্তিত্ব(personality) ও দক্ষতার (aptitude) মতো বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করে এবং এগুলোর সমন্বয়ে উপযুক্ত পেশা বা কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে সাহায্য করে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো অ্যাপটিটিউড (aptitude)। অ্যাপটিটিউড বলতে ব্যক্তির জন্মগত বা স্বাভাবিক দক্ষতাকে বোঝায়, যার মাধ্যমে সে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে কাজ করার সহজাত ক্ষমতা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তির গণিত সহজে বোঝার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, তবে বলা যায় যে তার গণিত বিষয়ে অ্যাপটিটিউড বা যোগ্যতা ভালো। ঠিক সেরকমই, যদি কোনো ব্যক্তির মানুষের সঙ্গে সহজে ও সাবলীলভাবে কথা বলার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে, তবে তার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা থাকার সম্ভাবনা বেশি।

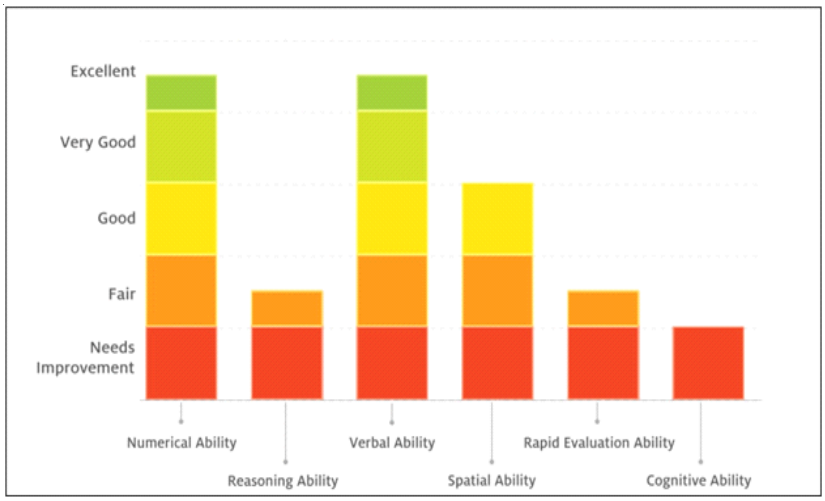

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ে ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন জরুরি, কারণ এতে বোঝা যায় একজন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে, অনুভব করে ও চিন্তা করে। তার কাজ করার স্বাভাবিক ক্ষমতাও ব্যক্তিত্বের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে।

এরপর পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যক্তিত্ব মানুষের চিন্তাভাবনা, আচরণ ও ব্যবহারকে প্রভাবিত করে এবং ব্যক্তি কীভাবে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশ করে, তা নির্ধারণ করে। ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ে ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন জরুরি, কারণ এতে বোঝা যায় একজন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে, অনুভব করে ও চিন্তা করে। তার কাজ করার স্বাভাবিক ক্ষমতাও ব্যক্তিত্বের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে।

এরপর আমরা আসছি আগ্রহ (**interest**) সংক্রান্ত ব্যাপারে। কেরিয়ার কাউন্সেলিংয়ে আগ্রহের মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কারণ ব্যক্তির আগ্রহ তার কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা, সন্তুষ্টি ও সাফল্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আগ্রহবিহীন কোনো পেশা দীর্ঘমেয়াদে ব্যক্তির জন্য ফলপ্রসূ হয় না।

বিশেষ যোগ্যতার বাইরে, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকও পরীক্ষা করে, যেমন স্মরণশক্তি, পড়াশোনার অভ্যাস, পরীক্ষার কৌশল এবং শেখার পদ্ধতি। এগুলো বড় হয়ে পড়াশোনা ও কাজে দক্ষ হতে সাহায্য করে।

এবার আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করি। এতক্ষণের লেখা পড়ে মনে হতে পারে যে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কেবল জন্মগত ক্ষমতার ভিত্তিতে কারও ক্যারিয়ার ঠিক করে দেয়। এটা স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, কারণ আমরা জন্মগত ক্ষমতার উদাহরণই আলোচনা করেছি, যা সাধারণত পরিবর্তন করা যায় না বলে মনে করা হয়।

শিশু বিশেষজ্ঞ বা শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলেন যে, এই ধারণা ব্যতিক্রম আছে। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে আমরা ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং অ্যাসেসসমেন্টের ফল অনুযায়ী চিকিৎসা-পরিকল্পনা করে থাকি।

উদাহরণস্বরূপ, নিচের গ্রাফে দেখা যায় একজন ব্যক্তির অ্যাপটিচিউড বা দক্ষতার মূল্যায়ন। আমরা দেখতে পাই যে ব্যক্তির গাণিতিক (Numerical) এবং শব্দগত (Verbal) যুক্তি করার ক্ষমতা খুব ভালো স্কোর করেছে, কিন্তু তার যৌক্তিক সামর্থ্য (Reasoning Ability), দ্রুত মূল্যায়ন করার ক্ষমতা (Rapid Evaluation Ability) এবং জ্ঞানগত ক্ষমতা (Cognitive Ability) তুলনামূলকভাবে কম। এই মূল্যায়ন এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে করা হয়, যা বেরোনো ক্ষমতাগুলি—যা জন্মগত (innate) এবং যথাযথ চিকিৎসা ছাড়া নির্মূল হওয়ার নয়—পরীক্ষা করে।

ছাত্রটি প্রায় ক্লাস ১২ পর্যন্ত পড়াশোনায় উত্তীর্ণ হতে পারলেও, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের পর সে সমস্যার মুখোমুখি হয়, তার কম যৌক্তিক ক্ষমতা (Reasoning Ability), দ্রুত মূল্যায়ন করার অক্ষমতা (Rapid Evaluation Ability) এবং জ্ঞানগত অক্ষমতার (Cognitive Ability)

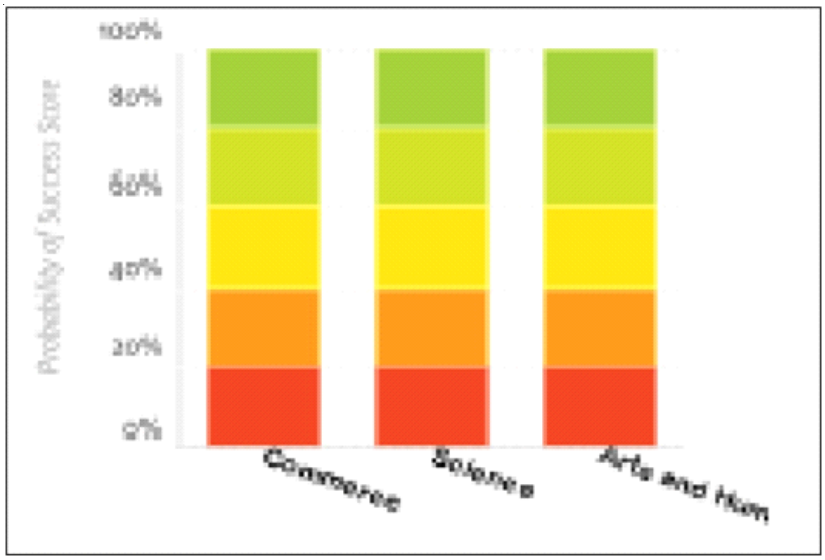

বিশেষ যোগ্যতার বাইরে, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকও পরীক্ষা করে, যেমন স্মরণশক্তি, পড়াশোনার অভ্যাস, পরীক্ষার কৌশল এবং শেখার পদ্ধতি। এগুলো বড় হয়ে পড়াশোনা ও কাজে দক্ষ হতে সাহায্য করে।

কারণে। পড়াশোনার বাইরে, সে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সামাজিক চাহিদা মোকাবেলার ক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে।

ছাত্রটি এত বছর ধরে লেখাপড়ায় এগিয়েছে শুধুমাত্র কথার ক্ষমতা (verbal ability) ও গাণিতিক ক্ষমতার (numerical ability) উপর ভিত্তি করে, কিন্তু স্নাতক পর্যায়ে এসে আটকে গেছে। সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা (যা গ্রাফে দেখানো হয়েছে) বিকশিত না হওয়ায়।

নবজাতক শিশু বিকাশ কেন্দ্রে যেহেতু তার সু-চিকিৎসা হয়েছে, ছাত্রটি তা ব্যবহার করে আজ এমন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে (দ্বিতীয় গ্রাফ দেখুন), যা ব্যবহার করে সে কমার্স, সায়েন্স বা আর্টস—যেকোনো ধারাতেই সাফল্যের ক্ষমতা অর্জন করেছে।

ভাগ্যিস সে আমাদের Bio-Psychoso-cial Career Counseling-এর সাহায্য নিয়েছে! অনর্থক টিউটর বা অপ্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং-এ টাকা নষ্ট না করে, সঠিক বিজ্ঞান ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আজ সে নিজের ক্যারিয়ার রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। ❑

আপনি কি জানেন

সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পুং জননকোষের ভূমিকাই শুধু আছে, স্ত্রীর কোনো ভূমিকাই নেই। সন্তান ছেলে কী মেয়ে হবে, তা মায়ের ওপর তথা তাঁর ডিম্বকোষের ওপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে স্বামী অথবা পরুষের জননকোষের ওপর।

জনস্বার্থে সুস্বাস্থ্য কর্তৃক প্রচারিত

সন্তানকে প্রয়োজনে শাসন করতে হবে কিন্তু তার মধ্যে যেন নিষ্ঠুরতা না থাকে। ভালোবেসে নিষেধ করা একটা 'আর্ট' যেটা বাবা– মাকে আয়ত্ত করতে হবে। ছেলেমেয়েদের ভুলত্রুটি শোধরাতে নিষেধ, একটু–আধটু শাসন হয়তো দরকার। কিন্তু তা যেন মাত্রাছাড়া না হয়। শাসনকেও শাসন করা প্রয়োজন—একথাটুকু ভুললে চলবে না।

শাসনকে শাসন করা

ডাঃ অমরনাথ মল্লিক
(মনোচিকিৎসক; কোঠারি হাসপাতাল, উডল্যান্ড হাসপাতাল, ডিসান হাসপাতাল)
মোবাইল : ৯৯০৩৮৩৯৯৫৮

■■ টাবলু ক্লাস ফাইভ–এ পড়ে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। নিয়মশৃঙ্খলা বেশি। ক্লাস টিচারেরা খুবই কড়া ধাতের, এতটুকু বেয়াদবি বা বাঁদরামি সহ্য করতে চান না। বেশি দুষ্টুমি করলে বা দুবার ফেল করলে বাবা–মাকে ডেকে টিসি ধরিয়ে দেয়। টাবলু বরাবরই একটু বেশি দুরন্ত, বাড়িতেও মায়ের কথা শোনে না, স্কুলেও গোলমাল করে। এক বন্ধুর সঙ্গে মারামারি করার জন্য 'প্যারেন্টস কল' হয়েছে। ওর মা অনেক কাকুতি–মিনতি করে টিসি আটকায়। টাবলু নিজের রাগ সংবরণ করতে পারে না, অল্পেতে রেগে ঝগড়া, মারামারি করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত ওর মা মনোবিদের শরণাপন্ন হয়েছে। ওর বাবা খুবই বদরাগি। ছেলেকে প্রচন্ড মারধোর করে থাকে।

■■ টিনা মা–বাবার দ্বিতীয় সন্তান। ওর দাদা কলেজে পড়ে, শান্তশিষ্ট, ভালো ছেলে। লেখাপড়ায় ভালো। টিনা দাদার থেকে ছয় বছরের ছোট। ক্লাশ নাইনে পড়ছে। লেখাপড়ায় মন নেই। সিনেমা আর সাজগোজ নিয়েই আছে। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে সারাদিন খিটিমিটি লেগেই আছে। মা মাঝেমধ্যে অতিষ্ট হয়ে চুল ধরে দু'চার ঘা দিয়ে দেয়। তারপর টিনার কান্নাকাটি, চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। আশপাশের ফ্ল্যাটের মানুষজন মা–মেয়ের ঝগড়া, মারামারি বেশ উপভোগও করে।

সব মা–বাবাই চায় ছেলেমেয়ে ভালো হোক, লেখাপড়া, গানবাজনা সবকিছু শিখুক, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। একটি দুটি সন্তানকে মানুষ করতে

বাবা-মা কতই না ভাবনা-চিন্তা, পরিকল্পনা ও অর্থ ব্যয় করে থাকে।

আগেকার দিনে 'পরিবার পরিকল্পনা'র চিন্তা সেভাবে ছিল না। প্ল্যান করে সন্তান নেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। তিন-চার বা আরো বেশি সন্তান ঘরে আসত। তাদের সবার মেধা, বুদ্ধি, যোগ্যতা একরকম হত না। দু-একজন অপেক্ষাকৃত বোকা, অসফল ছেলেমেয়ে থাকত, যারা সেভাবে জীবনে সফলতার মুখ দেখত না। তার জন্য মা-বাবার বেশি আফশোষ বা দুঃখ থাকত না। তারা সাধারণভাবে বেড়ে উঠত। কিন্তু বর্তমান যুগ হল চরম পণ্যমানসিকতা ও প্রতিযোগিতার। ছোট বয়স থেকে প্রতিযোগিতা, উৎকর্ষতার লড়াই। ইঁদুর দৌড়। কোথাও হারলে বা পিছিয়ে গেলে চলবে না। ছোট বয়স থেকে এই প্রতিযোগিতার লড়াইতে হেরে যাওয়া যেমন অভিভাবকেরা সহজে মেনে নিতে পারে না, তেমনি ছেলেমেয়েরাও বিরক্ত, হতাশ ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। হারকে সহজে মেনে নিতে চায় না, রাগে-দুঃখে, অবসাদে ডুবে যায়।

অভিভাবকেরাও হতাশ হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েকে বকাঝকা, শাসন করে থাকে। অনেক রাগি, মা-বাবা মারধোরও করে থাকে। আগেকার দিনে স্কুলে বা বাড়িতে 'শাসন' খুবই সাধারণ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বা মানুষ করার জন্য একটি অন্যতম পদ্ধতি বলে মনে করা হত। স্কুলে দুষ্টুমি করলে মাষ্টারমশাইরা মারতে কসুর করতেন না। হাত বা বেত ব্যবহৃত হত। বাড়িতেও ছেলেমেয়েরা কম-বেশি মারধোর খেয়ে থাকত। কিন্তু, এখন আধুনিক মনোবিদ, শিক্ষাবিদরা 'প্রহার বা মারা-বকা'কে ছেলেমেয়ে মানুষ করার উপায় বলে মেনে নিতে রাজি নন। স্কুলে ছেলেমেয়েকে প্রহার করলে অভিভাবকেরা প্রতিবাদ করে এমনকি থানাপুলিশ করার কথাও শোনা যায়। বাড়িতেও শাসন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গেছে। 'বকা', মারা, এমনকি 'নিষেধ' করাও বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষা পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

যারা ছেলেমেয়েদের অতি সামান্য ভুল ইত্যাদির কারণে বকাবকি, মারধর করে থাকেন, সেই অভিভাবকদের অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে সুখী নয়। নানা কারণে তাদের মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত থাকে। অনেকেই আবার চরম হতাশা বা ডিপ্রেশনের শিকার হয়। প্রায় সব সময় তাদের মন বিগড়ে থাকে।

অভিভাবক বা বাবা-মায়েদের ছেলেমেয়েদের তিরস্কার বা প্রহার করার সম্ভাব্য কারণ

● অনেক অভিভাবক মা-বাবা ও শিক্ষকদের ধারণা, শাস্তি শিক্ষার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। বকা, ধমক ও মারধর না করলে ছেলেমেয়ের শিক্ষা থেকে শুরু করে আচার-আচরণ কিছুই উপযুক্ত হয় না। মারধর না করলে ছেলেমেয়ে ভয় পায় না ও কথা শুনতে চায় না। এই ধারণা যে ভুল তা অনেক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে কথা বললে অনেক কাজ হয়। সব সময় তিরস্কার বা প্রহারের প্রয়োজন হয় না।

● অধিকাংশ অভিভাবক যারা কথায় কথায় সন্তানের গায়ে হাত তোলে, শারীরিক নির্যাতন করে তাদের নিজেদের শৈশব খুব একটা সুখের ও স্বস্তির নয়। তাদের অনেকেই হয়তো ছোটবেলায় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন । অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা থাকে যে, ছেলে বা মেয়েকে লেখাপড়ার জন্য বকুনি বা শারীরিক নির্যাতন করতে হয়। তা না হলে তারা ফাঁকি মারে, লেখাপড়ায় মনোযোগী হয় না।

● যারা ছেলেমেয়েদের অতি সামান্য ভুল ইত্যাদির কারণে বকাবকি, মারধর করে থাকেন, সেই অভিভাবকদের অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে সুখী নয়। নানা কারণে তাদের মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত থাকে। অনেকেই আবার চরম হতাশা বা ডিপ্রেশনের শিকার হয়। প্রায় সব সময় তাদের মন বিগড়ে থাকে। কোনো কিছুতেই তাদের শান্তি থাকে না। তারা ছেলেমেয়ের সামান্য ভুলভ্রান্তি (যা অল্প বয়েসে হতেই পারে) দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে ও মারমুখী হয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি তারা ছেলেমেয়েদের শারীরিক নির্যাতনই করে থাকে ।

● অনেক স্বামী-স্ত্রী আছে যারা সন্তান চায়নি কিন্তু সন্তান এসে গেছে অর্থাৎ তাদের সন্তান নেবার কোনো প্ল্যান বা পরিকল্পনা ছিল না। এই তথাকথিত অবাঞ্ছিত সন্তানেরা বাবা-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা অনেকেই অবহেলার শিকার হয়। সামান্য ভুলভ্রান্তির জন্য বাবা-মা তাদের তিরস্কার, প্রহার করে থাকে। অবাঞ্ছিত বা অনাকাঙ্খিত সন্তানদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। তারা যা করতে যায় তাতেই ভুল! অতি সামান্য ভুল বা দোষের জন্য বাবা বা মা

বকাবকি, মারধর করে থাকে। অনেক সময় নির্মমভাবে প্রহার করা হয়, যার ফলে হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

● যে দম্পতিদের মধ্যে মনের বোঝাপড়া কম, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, আবেগ, ভালোবাসার অভাব, যারা সবসময় পরস্পরের দোষ খুঁজতে ব্যস্ত থাকে তাদের সন্তানদের অনেক সময় বাবা-মায়ের কঠিন শাসন ও অবহেলার শিকার হতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি রাগ, বিদ্বেষ সন্তানের ওপর প্রতিফলিত হয়। অসহায়, নিষ্পাপ ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়ের পরস্পরের প্রতি অভিযোগ ও বিদ্বেষের কথা শুনতে হয়। এর জন্য ছেলেমেয়েদের মানসিক দিক থেকে চাপ সহ্য করতে হয়, তারা ভীতু ও উৎকণ্ঠাপ্রবণ হয়ে পড়ে, অনেক সময় ডিপ্রেশনের শিকারও হয়।

● অভিভাবক, মা-বাবার যদি পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্বের সমস্যা যেমন—'বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি' বা 'অ্যান্টিসোশাল পার্সোনালিটি', 'সিমুয়েড পার্সোনালিটি' প্রভৃতি থাকে অথবা বাবা-মায়ের কোনো একজন মানসিক অসুস্থ যেমন ডিপ্রেশন, সিজোফ্রেনিয়া, অ্যালকোহল ইত্যাদির নেশায় আক্রান্ত হয় তাহলে ছেলেমেয়ের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ঘটে থাকে। অনেক বাবা আছেন যারা ছেলেমেয়েকে খুব বেশি মারধর করে। আঘাত দিয়ে মনের দিক থেকে কোনো লজ্জা বা দুঃখ তো হয়ই না, বরং মানসিক আনন্দ লাভ করে থাকে। 'স্যাডিজম' আক্রান্ত অভিভাবক সন্তানকে পীড়া দিয়ে, আঘাত করে আনন্দ অনুভব করে থাকে। 'স্যাডিস্ট' অভিভাবক নিজের সন্তানকেই নির্যাতন করে এক অদ্ভুত স্বস্তি বা আনন্দ অনুভব করে। তাকে নির্মমভাবে মারে, সে যে আর্ত চিৎকার করে, সেটা শুনে তৃপ্ত হয়।

ছেলেমেয়েকে মারধর করা থেকে কীভাবে অভিভাবকদের বিরত করা যায়

ছেলেমেয়েকে বকা বা মারাটা অনেক বাবা-মায়ের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ছেলেমেয়েকে ছোট বয়স থেকে বড় করতে গিয়ে অনেক মা-বাধাই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন ও তাদের হাত উঠে যায়। এই ধরনের অভিভাবকদের জন্য প্যারেন্টাল কাউন্সেলিং খুবই জরুরি। এখানে কাউন্সেলর অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন, লেখাপড়া শেখার প্রাথমিক উপাদানগুলো বুঝিয়ে

বর্তমান যুগ হল চরম পণ্যমানসিকতা ও প্রতিযোগিতার সময়। ছোট বয়স থেকে প্রতিযোগিতা, উৎকর্ষতার লড়াই। ইঁদুর দৌড়। কোথাও হারলে বা পিছিয়ে গেলে চলবে না। ছোট বয়স থেকে এই প্রতিযোগিতার লড়াইতে হেরে যাওয়া যেমন অভিভাবকেরা সহজে মেনে নিতে পারে না।

বলে থাকে। ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত বকাবকি করলে বা মারধর করলে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন আসে ও আঘাত লাগে সে বিষয়ে জানানো প্রয়োজন। বাবা-মা যদি অতিরিক্ত শাসন করে, অন্যের সঙ্গে তুলনা করে বা সামান্য কারণে বকাবকি করে থাকে তাহলে সন্তানের মনে হীনম্মন্যতাবোধ জন্মায়, তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। বাবা-মায়ের প্রতি বিশ্বাস, আস্থাই যে কমে যায় তাই নয়, তাদের শ্রদ্ধা করতে, ভালোবাসতে ভুলে যায়। বাবা-মায়ের প্রতি তাদের মনে প্রতিহিংসা ও আক্রোশ জন্মাতে শুরু করে। তারা শুধু মনের চাওয়া-পাওয়া লুকোতে থাকে না, ভবিষ্যতে মা-বাবাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। অবশ্য অনেক সন্তান বড় হয়ে শৈশব বা কৈশোরের এই দুঃখজনক, বেদনাদায়ক স্মৃতি সাময়িকভাবে ভুলে গেলেও সময়ে সময়ে এই নির্যাতনের ঘটনা তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে। বাবা-মাকে বুঝতে হবে, সন্তান আর যাইহোক তাদের প্রতিপক্ষ নয়, সন্তানকে বড় করে তুলতে গিয়ে গায়ের জোর যত না দরকার, তার থেকে বেশি সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা প্রয়োজন। অতিরিক্ত আদর বা মাত্রাছাড়া প্রশ্রয় কখনোই ভালো নয়। মাঝেমধ্যে বারণ করা, বকা দরকার কিন্তু তার প্রয়োজন ও মাত্রা যদি সঠিক হয় তাতে সন্তানের মঙ্গলই হয়। অভিভাবকদের নিজেদের লাগামছাড়া রাগ সংবরণ করতে শিখতে হবে। সন্তানকে বড় করে তুলতে গেলে অর্থের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন চলতে হবে তেমনি মনে রাখতে হবে সন্তানকে জীবনমুখী শিক্ষা দেওয়া দরকার।

কথায় বলে 'শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে'। সন্তানকে প্রয়োজনে শাসন করতে হবে কিন্তু তার মধ্যে যেন নিষ্ঠুরতা না থাকে। ভালোবেসে নিষেধ করা একটা 'আর্ট' যেটা বাবা-মাকে আয়ত্ত করতে হবে। ছেলেমেয়েদের ভুলত্রুটি শোধরাতে নিষেধ, একটু-আধটু শাসন হয়তো দরকার। কিন্তু তা যেন মাত্রাছাড়া না হয়। শাসনকেও শাসন করা প্রয়োজন—একথাটুকু ভুললে চলবে না। ❑

> **মা–বাবারা যদি সন্তানকে নিজের প্রত্যাশা পূরণের যন্ত্র বলে মনে করেন, তাহলেই সমস্যা, দূরত্ব আসবে সম্পর্কে। কারণ একজন ছেলে বা মেয়ে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বের অধিকারি। সে তার মতো বেড়ে উঠবে, স্বপ্ন পূরণ করবে নিজের মতো। তাই বোঝা দরকার তার দক্ষতা ও প্রতিভা কোন দিকে? সেটি মা–বাবার প্রত্যাশার সঙ্গে নাও মিলতে পারে।**

বাবা–মা'র প্রতি টান কম?

ডঃ শম্পা ঘোষ
(সাইকোলজিস্ট ও কাউন্সেলর)
মোবাইল : ৯৭৭৫১২১৪৬০

একজন ক্লাস এইটে পড়া ছাত্র–ছাত্রীরও আজকাল বাবা-মা'র প্রতি তাদের আচরণে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রচুর তর্ক করছে, খারাপ ভাষাও বলছে, এমনকী গায়ে হাতও তুলছে। বাবা– মায়ের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা সে অনুভব করছে না।

■■ সোহিনী ক্লাস টেনে পড়া একজন ছাত্রী। শোনা যাচ্ছে সে বিভিন্ন সম্পর্কে জড়াচ্ছে, উশৃংখল জীবন যাপন করছে, মা–বাবার কোনো কথাই শুনছে না, মুখে মুখে তর্ক করছে, একা একা থাকতে পছন্দ করছে।

এরকম অজস্র উদাহরণ আজকাল আমাদের চারপাশে দেখতে পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠছে সমাজ বদলাচ্ছে তার সঙ্গে কি পাল্লা দিয়ে জেনারেশনকে বুঝতে আমাদের কোথাও কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে?

যদি প্রথম থেকে শুরু করা যায় তাহলে বলব মিস্‌কমিউনিকেশন একটা বড় কারণ। চটজলদি ব্যস্ততার যুগে, যে যার মতো করে ব্যস্ত। মা বাবা দেখছেন সন্তানের সাফল্য কিন্তু একটি মানুষের বড় হওয়ার জন্য সঠিক চর্চা ও পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন সময়, আর বাবা মায়েরা আজকাল এটাই ভুলে যান। একটি চারা গাছকে এনে যদি আশা করে থাকি, সুন্দর ফুল ফুটবে আর তাকে সঠিক পরিচর্যা না করি তাহলে কিন্তু গাছটি উপরে যাবে, মানুষের ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য।

সন্তান দেখছে, যা চাইছি তাই তো পাচ্ছি, আর কীসের প্রয়োজন মা-বাবাকে! মা ও বাবা ভাবছেন সবই তো দিচ্ছি তবু সে আমার মনের মতো কেন হচ্ছে না—এইভাবে তৈরি হচ্ছে বন্ডিংয়ের অভাব।

আধুনিক গ্যাজেট ছেলেমেয়েদের একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে দিচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মোবাইল ফোন। বাবা–মা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আর শিশুকালীন সময় থেকে ছেলেমেয়েদেরও মোবাইল ফোন হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সামাজিকতার মূল্যবোধ থেকে সন্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

মা–বাবারা যদি সন্তানকে নিজের প্রত্যাশা পূরণের যন্ত্র বলে মনে করেন, তাহলেই সমস্যা, দূরত্ব আসবে সম্পর্কে। কারণ একজন ছেলে বা মেয়ে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বের অধিকারি। সে তার মতো বেড়ে উঠবে, স্বপ্ন পূরণ

করবে নিজের মতো। তাই বোঝা দরকার তার দক্ষতা ও প্রতিভা কোন দিকে? সেটি মা-বাবার প্রত্যাশার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যখনই ছেলেমেয়েদের সাথে, কারো তুলনা করা হবে সে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, দূরত্ব তৈরি হবে মা-বাবার সঙ্গে। কারণ এতে তার রাগ হবে। সে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগবে এবং মনে কররে মা বাবা তাকে বিশ্বাস করে না। এটাও কিন্তু দূরত্বের একটি বড় কারণ।

কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক দূরত্ব আরেকটি কারণ। দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য কাজের প্রয়োজনে অনেক সময় মা-বাবা সন্তানের থেকে দূরে থাকেন। ফলে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়, যা সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। দ্বিতীয়ত কাছে থাকলেও মা-বাবা সন্তানকে সময় দিতে পারেন না। ফলে সন্তান মন খুলে মা-বাবার সঙ্গে তাদের কথা ভাগ করে নিতে পারে না। পারে না তাদের সমস্যাগুলো নিজের মতো করে আলোচনা করতে। এর ফলে তারা, বাবা-মা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে।

অনেক সময় মা বাবা অতিরিক্ত শাসন করলে সন্তানদের মধ্যে ভয় তৈরি হয়। যা আবেগের আদান-প্রদান কমিয়ে দেয় ও দূরত্ব তৈরি করে।

মা-বাবা অনেক সময় রেগে গিয়ে ছেলেমেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন এবং অপমানজনক কথাও বলে থাকেন। এগুলি কিন্তু ছেলেমেয়েদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক সময় তার আত্মবিশ্বাসকেও কমিয়ে দিতে পারে। তাই সন্তান যে আলাদা ব্যক্তিত্ব, সে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—এ কথা মাথায় রেখে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সন্তান ছোট থেকে মা-বাবার মধ্যে যা যা দেখবে, শুনবে—তারই রিফ্লেকশন হবে তার মধ্যে।

তাই বর্তমানে ভীষণ প্রয়োজনীয় বিষয় হল মা-বাবার সাথে ছেলেমেয়েদের একটা শক্তিশালী। বন্ডিং তৈরি করা, তাহলেই আমরা একটা সুস্থ সমাজ পাব।

বাবা-মা যেগুলো অনুসরণ করবেন

- সন্তানকে সময় দিন ।
- যা বলবে তা সঙ্গে সঙ্গে হাতে তুলে দেওয়া নয়।
- মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন প্রয়োজন ছাড়া।

কাছে থাকলেও মা-বাবা সন্তানকে সময় দিতে পারেন না। ফলে সন্তান মন খুলে মা-বাবার সঙ্গে তাদের কথা ভাগ করে নিতে পারে না। পারে না তাদের সমস্যাগুলো নিজের মতো করে আলোচনা করতে। এর ফলে তারা, বাবা-মা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে।

- আপনাদের প্রত্যাশা, ইচ্ছা, সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেবেন না।
- অকারণ মারধোর বকাঝকা করবেন না।
- অন্যায় কিছু করলে তাকে ইতিবাচক ভাবে বোঝান।
- মা বাবা নিজেদের মধ্যে অশান্তি, ঝগড়া করবেন না সন্তানের সামনে।

ছেলেমেয়েদের করণীয়

- বুঝতে হবে বাবা-মা আলাদা ব্যক্তিত্ব। সবসময় তাদের মধ্যে ঢুকে পড়া ঠিক নয়।
- শৃংঙ্খলায় না চললে ভবিষ্যতে আমারই ক্ষতি। কারণ কারো ভরসায় নয় আমার ভবিষ্যৎ আমাকেই তৈরি করতে হবে। আমি আমার মনের মতো করে জীবন কাটাতে চাই।
- মা-বাবা কী, কেন বলতে চাইছেন? তা একটু বোঝার চেষ্টা করা। যেহেতু অভিজ্ঞতায় ছোট তাই বড়দের যে কথাগুলি ইতিবাচক সেগুলিকে গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- মোবাইল প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার নয় কারণ এর থেকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতি হয় আমাদের।

এক কথায় মা বাবা ও ছেলেমেয়েরা পরস্পরের জন্য সময় বার করে অন্তত সপ্তাহে কিছুটা সময় দিতে হবে নিজেদেরকে। তাতেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সবাই সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন। ❑

কোষ্ঠী বিচার আগে নয়,
রক্তবিচার আগে

বিবাহের পূর্বে রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিন— দুজনেই

থ্যালাসেমিয়ার

বাহক কিনা।

জনস্বার্থে 'সুস্বাস্থ্য' পত্রিকা কর্তৃক প্রচারিত

পৃথিবী যত এগোচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে মানুষের জীবনে এক বিশেষ ধরনের চিকিৎসা আছে, যার কোনো প্রেসক্রিপশন নেই। যার ডোজ মাপা হয় না সিরিঞ্জে, কিন্তু মাপা যায় হৃদস্পন্দনে। এর প্রভাব বোঝা যায় ল্যাব রিপোর্টে, নয় মানুষের চোখের জল শুকিয়ে যাওয়ার পর কিংবা হাসি ফেরার ভাঁজে।

হিউম্যান মেডিসিন

ওষুধ ছাড়াই যেখানে মানুষ বাঁচে

ঈশানী মল্লিক

''নিজের মানুষের সামান্য যত্ন, ভালো আচরণ, ভরসার উপস্থিতি—এগুলোই সবচেয়ে বড় হিউম্যান মেডিসিন।''

মানুষের উপস্থিতি, স্পর্শ, কথন আর সম্পর্ক—আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'জীবনের থেরাপি'।

পৃথিবী যত এগোচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে মানুষের জীবনে এক বিশেষ ধরনের চিকিৎসা আছে, যার কোনো প্রেসক্রিপশন নেই। যার ডোজ মাপা হয় না সিরিঞ্জে, কিন্তু মাপা যায় হৃদস্পন্দনে। এর প্রভাব বোঝা যায় ল্যাব রিপোর্টে, নয় মানুষের চোখের জল শুকিয়ে যাওয়ার পর কিংবা হাসি ফেরার ভাঁজে। মনোবিজ্ঞানীরা এই শক্তিকে বলেন—'হিউম্যান মেডিসিন' অথবা মানুষে-মানুষে সুস্থ হওয়ার বিজ্ঞান।

ওষুধ নেই, হাসপাতাল নেই, সার্জারি নেই।

তবু—একটি শব্দ, একটি আলিঙ্গন, একটু পাশে থাকা, একটা ফোন—বিশ্বাসে ভর করে মানুষ চাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে।

মস্তিষ্ক এমন শক্তিশালী রাসায়নিক ঢেউ তোলে, যা আধুনিক মেডিসিনও এড়াতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন, এই 'মানুষের ওষুধ' কীভাবে কাজ করে?

মানুষের পাশে মানুষ থাকলে—

মস্তিষ্কে পাঁচটি প্রধান রাসায়নিক সক্রিয় হয়ে ওঠে :

- **অক্সিটোসিন**—ট্রাস্ট হরমোন।

নিরাপত্তা, বিশ্বাস, সংযুক্তি দেয়, উদ্বেগ কমায়, হৃদস্পন্দন স্থির করে।

- **ডোপামিন**—রিওয়ার্ড হরমোন।

প্রিয় মানুষকে দেখলে বা তাঁর কণ্ঠ শুনলে মেন্টাল এনার্জি বাড়ে, ডিপ্রেশন কমে।

• **সেরোটোনিন**—মুড স্টেবিলাইজার

সহানুভূতি, সম্মান, ভালো ব্যবহারে স্থিতিশীলতা আসে—রাগ, দুশ্চিন্তা কমে।

• **এন্ডোরফিন**—ন্যাচারাল পেইনকিলার।

একটু হাসি, একটু স্পর্শ—ব্যথা শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে।

• **গাবা**

প্রিয়জন পাশে থাকা মানেই ভয়ের সার্কিট বন্ধ হওয়া, মস্তিষ্কে শান্তি আসা।

এটা শুধু আবেগ নয়—এটা পিওর নিউরো-কেমিস্ট্রি।

গবেষণায় কী মিলল

হার্ভার্ডের ৮৫ বছরের গবেষণা বলছে, ''মানুষের জীবনে সুখ, স্বাস্থ্য, আয়ু—সব নির্ভর করে মানসম্পন্ন সম্পর্কের উপর।

• যারা ইমোশনাল সাপোর্ট পান তাদের ডিপ্রেশন প্রায় অর্ধেক, শরীরের ইমিউনিটি ২ গুণ, আয়ু ৭-১০ বছর বেশি।

• যারা টক্সিক সম্পর্কের মধ্যে আছেন তাদের কর্টিসল ক্রমাগত বেশি হয়, হৃদরোগের ঝুঁকি দ্বিগুণ, বার্ধক্য দ্রুত।

গবেষক ওয়াল্ডিঙ্গার মতে''Supportive relationships are the most reliable human medicine''.

NIMHANS-এর রিপোর্ট বলছে :

ভালোবাসা + বিশ্বাস

◆ ঘুম ঠিক করে।
◆ ব্লাডপ্রেসার কমায়।
◆ স্নায়ু শান্ত রাখে।

তিক্ত সম্পর্ক

◆ ইনসোমনিয়া।
◆ হরমোনাল ইমব্যালেন্স।
◆ মেন্সট্রুয়াল ইররেগুলারিটি।
◆ থাইরয়েড ও ব্লাডপ্রেসার বাড়ায়।

অর্থাৎ সম্পর্ক শুধু মন নয়, শরীর নিয়ন্ত্রণ করে।

স্ট্যানফোর্ডের 'Touch Therapy Study' জানাচ্ছে :

প্রিয়জনের হাত ধরা—

◆ ব্যথার অনুভূতি শতকরা ৪০ ভাগ কমায়।
◆ ভয় ও প্যানিক সার্কিট বন্ধ করে।
◆ হৃদয়ের রিদিম স্থির করে।

চিকিৎসকের ভাষায়—''Every hug is a dose of human medicine''.

UCLA Social Neuroscience Lab বলছে,

যাঁরা নিয়মিত সাপোর্ট পান—

◆ ইমিউন সেল শতকরা ২৫ ভাগ বেশি।
◆ সংক্রমণ কম হয়।
◆ স্ট্রেস-ইনডিউসড ইনফ্লামেশন কমে।

অর্থাৎ মানুষের ভালোবাসা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

◆ মানুষের মানুষ হওয়া—কেন আজ আরও জরুরি। আজকের পৃথিবী তিনটি বিপদের মুখে—

ক্রনিক লোনলিনেস—অর্থাৎ নীরব মহামারি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা থেকে জানা গেছে—বিশ্বে তিনজনের একজন একাকিত্বে ভুগছেন।

এওষুধ নেই, হাসপাতাল নেই, সার্জারি নেই। তবু—একটি শব্দ, একটি আলিঙ্গন, একটু পাশে থাকা, একটা ফোন—বিশ্বাসে ভর করে মানুষ চাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। মস্তিষ্ক এমন শক্তিশালী রাসায়নিক ঢেউ তোলে, যা আধুনিক মেডিসিনও এড়াতে পারে না।

এই একাকিত্ব—

◆ ধূমপানের সমান ক্ষতি করে ।
◆ ডিপ্রেশন বাড়ায়।
◆ শরীরে টক্সিক কেমিক্যাল ছড়ায়।

ডিজিট্যাল বার্নআউট

স্মার্টফোন, স্ক্রিন, নোটিফিকেশন—

মানুষকে মানুষের থেকে দূরে নিয়ে গেছে। যেখানে ''প্রেজেন্স'' বদলে গেছে ''অনলাইন''-এ।

রিলেসনশিপ ইনসিকিউরিটি

বিশ্বাস কমেছে, ভয় বেড়েছে, অস্থিরতা বাড়ছে, দাম্পত্যে ফাটল, ব্রেকআপ, ভুল বোঝাবুঝি—সব বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে 'হিউম্যান মেডিসিন' আরও গুরুত্বপূর্ণ।

হিউম্যান মেডিসিন কোথায় জন্মায়?

১. সহানুভূতিতে

কারও ব্যথা বুঝতে পারা—

◆ মস্তিষ্কে মিরর নিউরন সক্রিয় হয়।
◆ বন্ডিং তৈরি হয়।

২. সম্মানে

◆ সম্মান রিলেশনশিপে থাকে না।
◆ সম্মান হল ইমোশনাল সেফটি।
◆ মস্তিষ্ক নিরাপদ বোধ করে।

৩. নজরে রাখা

কাউকে সাইলেন্টলি অবজার্ভ করা—

◆ ''আই কেয়ার'' বার্তা দেয়।
◆ মস্তিষ্কে ট্রাস্ট সার্কিট সক্রিয় হয়।

১. চাইলে পাশে থাকা

ডিমান্ডে নয়, প্রয়োজনে পাশে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী ইমোশনাল থেরাপি।'হিউম্যান মেডিসিন' শুধু ভালোবাসায় নয়, আচরণে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে ''ওষুধ'' বানিয়ে ফেলতে

উপস্থিতি—এটাই সবচেয়ে বড় হিউম্যান মেডিসিন।

পারে। তার ৪টি আচরণে—

•স্টেবিলিটি

একই কথা, একই আচরণ—নার্ভাস সিস্টেম রিল্যাক্স করে, ট্রাস্ট রি-বিল্ড হয়।

•প্রেডিক্টেবিলিটি

একে বলা হয় 'সেফ প্যাটার্ন'—রিলেশনশিপ রিনিউয়াল হয়।

•নন-রিয়াক্টিভ কামনেস

নন-রিয়াক্টিভ আচরণ—অপরজনের মস্তিষ্কে কিউরিওসিটি, অ্যাট্রাকশন, রেসপেক্ট বাড়াচ্ছে, কনট্রোল শিফট হচ্ছে।

•ভ্যালু গিভিং

ছোট ছোট কেয়ার, সাহায্য, নির্ভরযোগ্যতা—মানুষকে ইমোশনালি ডিপেনডেন্ট করে ফেলে, ফিজিক্যাল ইন্টিমেসি অটোমেটিক্যালি ফিরে আসে।

মানবিক স্পর্শে যে সুস্থতা ফিরে আসে : বাস্তব কেস স্টাডি

কেস১: সল্টলেকের ৪২ বছর বয়সী কর্মজীবী। স্ট্রেসে পিরিয়ড ঠিকমতো না হওয়া। ব্যথা, ঘুমের সমস্যা। নিজের স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ। কিন্তু কর্মস্থলের এক সহকর্মী নিয়মিত তার কাজ সহজ করে দিত। চা এনে দিত, অল্প সময় পাশে বসত। একটা শব্দ বলত 'আমি আছি'। এর ফলে ২ মাসে যা ঘটল—ঘুম ঠিক হয়ে যায় বিপি স্বাভাবিক, প্রতি মাসে সঠিক সময়ে পিরিয়ড হয়। ডাক্তার বললেন 'এটাই পিওর হিউম্যান মেডিসিন।'

কেস ২ : ৫৮ বছরের হৃদরোগী। স্ত্রী সপ্তাহে তিনবার হাসপাতালে এসে হাতে হাত রেখে বসতেন। ডাক্তাররা বলেন, হার্ট রেট স্বাভাবিক থাকার কারণ হিউম্যান প্রেজেন্স।

টক্সিক হিউম্যান মেডিসিন : মানুষের দ্বারা মানুষের ক্ষতি—

যাঁরা করে—অপমান করে, গালিগালাজ করে, ভাঙা বিশ্বাসকে অস্ত্র করে, ইমোশনালি ব্যাকমেল করে, তাঁরাও একইভাবে মস্তিষ্কে 'হরমোন স্ট্রম' তৈরি করে—

- কর্টিসল বাড়ে।
- হজমশক্তি, প্রতিরোধ শক্তি খারাপ হয়।
- ঘুম নষ্ট।
- পিরিয়ড ব্যাহত হয়।
- ডিপ্রেশন, শরীরের যন্ত্রণা বাড়ে

অর্থাৎ মানুষই এজনকে বাঁচায় আবার মানুষই আর একজন মানুষকে জীবন্ত লাশে পরিণত করে।

এই পৃথিবীতে ওষুধ আছে হাজার রকম। ডাক্তার আছে হাজার জন। কিন্তু নিজের মানুষ, তার আচরণ, তার উপস্থিতি—এটাই সবচেয়ে বড় হিউম্যান মেডিসিন।

একটি কথা 'থাকো', একটু চোখের দৃষ্টি, একটু পাশে থাকা, একটু সাইলেন্ট কেয়ার, একটু যোগাযোগ—এই পাঁচটি জিনিসের প্রভাব :

- ডিপ্রেশন কমায়।
- শরীর বাঁচায়।
- হৃদয় গড়ে।
- বিশ্বাস ফেরায়।
- শারীরিক সম্পর্কে আগুন জ্বালায়।
- একজন মানুষকে আরেকজন মানুষের প্রতি অপরিহার্য করে তোলে। ❑

তথ্য সহায়তায় :
ডাঃ অমিত ভট্টাচার্য
(বিশিষ্ট সাইক্রিয়াটিস্ট এবং ইনস্টিটিউট অব সাইকিয়াট্রি ডাইরেক্টর, এস.এস.কে.এম হাসপাতাল)

স্মৃতি বৃদ্ধির সাতকাহন

এক অননুকরণীয় লেখনিতে

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর কৌশল

লিখেছেন :

ডাঃ মধুসূদন ভৌমিক

মূল্য ১০০ টাকা

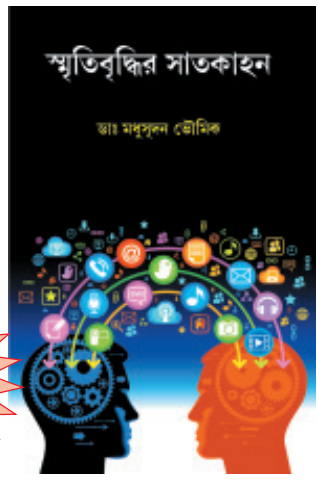

কন্যা ভ্রূণ হত্যা!

সমাজ মনের আয়না

পৌলমী ভট্টাচার্য

''আমরা ভ্রূণ নই
ভ্রূণা জন্ম দিও না, মা
জেনে শুনে, কখনও ধরো না
এ বৃথা মাংসপিন্ড
কখনও ধরো না''...

আশির দশক। কবিতা সিংহের কলম থেকে বের হওয়া ছত্র। আল্ট্রা সাউন্ড মেশিনের রমরমায় গর্ভস্থ শিশুর অবস্থার কথা জানার ব্যবস্থা সর্বসমক্ষে এলে এমন কবিতার ক্ষরণই স্বাভাবিক। আশ্চর্য এই যে এ কবিতার প্রতিপাদ্য এতকাল পরেও সমান প্রাসঙ্গিক। এ কেবল আশ্চর্য নয়। চূড়ান্ত বেদনার। ছাপোষা যুক্তিতে একে নাকচ করার উদ্যোগ, সে তো আরও বড় ভয়ংকর। ভয়ংকর এইজন্য যে এই চেষ্টার মধ্যেই যে লুকিয়ে থেকে যায়, এ সমস্যার যাবতীয় শিকড়। অস্তিত্বকে অস্বীকার করার চেষ্টা

কীসের অস্তিত্ব? কন্যা ভ্রূণ হত্যার অস্তিত্ব। আদৌ এটি হয় না। বা, এরকম ভাবে এখন আর লোকে ভাবে না। এই বালখিল্য ভাবনায় উত্তর আধুনিকতার প্রতি আস্থা ফুটে উঠলেও চূড়ান্ত সত্যকে অস্বীকার করা চোখ এড়ায় না। তবে, সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কন্যা ভ্রূণ হত্যার মূল থেকে কন্যা সন্তান অবহেলার দিকটিকে আলাদা করে রাখলে অনেক জরুরি দিকই আড়ালে থেকে যায়। আসলে গোটা পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই খোদ কলকাতা শহরের জনমানসের ছবিটি পরিষ্কার হওয়া দরকার। আর সেখানেই কন্যা সন্তান অবহেলা এবং কন্যা ভ্রূণ হত্যা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যদিও, সুখের কথা রেনেসার প্রভাব বাংলায় তীব্র ছিল বলেই, সারা ভারতের তুলনায় এখানে কন্যা সন্তান অবহেলা বা ভ্রূণ হত্যার দাপট অপেক্ষাকৃত কম। তবে, এই আপেক্ষিকতার তুল্যমূল্য বিচারে নিশ্চিন্ত হওয়ার দিন এখন শেষ। বাঙালির নানান অনুকরণ– প্রিয়তার মতোই, শুধুমাত্র পুত্র আকাঙ্খায় জলের মতো অর্থ ব্যয় করতে এখন সে পিছুপা নয়। সরকারি প্রকল্প বা অন্য অনেক চেষ্টাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অন্ধকারের প্রলম্বিত দিকটি বাংলার জীবনে চোরাগোপ্তা মুখে দিব্য বিরাজমান। এর বীজ অনেক গভীরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ সামাজিক চেহারার বদল ঘটেছে। দেশভাগ, আর্থিক চাপ, সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার অংশ স্বরূপ ছোটো পরিবার সুখী পরিবারের ধারণায় ঘরে ঘরে শুধুমাত্র ছেলে সন্তান চাওয়ার একটি মানসিক ব্যাধি মহীরুহের আকার নিয়েছে। আশির দশকে আল্ট্রা সাউন্ডের হৈ হৈ আগমনে এমন ঘরোয়া ইচ্ছা যখন বাজারি প্রাতিষ্ঠানিকতার মোড়ক পেল, তখন সোনায় সোহাগা!

আর এই প্রাতিষ্ঠানিকতা একান্ত বাজারমুখী বলেই, চাহিদা ও যোগানের চেনা ছকটি নতুন করে খাতা খুলল। কাজের ক্ষেত্র বিশেষে দেখা গেল আঁতাত বেশ গভীরে। আসছি সে প্রসঙ্গে, পরে। বেশ ক'দিন আগেও মনে করা হত, মেয়ে সন্তান সংসারের কাঙ্খিত নয়, তার কারণটি আর্থিক। সোজা বাংলায় বললে মেয়েকে অর্থ ব্যয় করে বিয়ে দিতে হয়। আর্থিক চাপ পড়ে সংসারে। মেয়েরা পরনির্ভরশীল। ফলত, তার নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বীকৃতির দিকটিকে মাথায় রেখে, পরিবারের কাছে মেয়ে মানেই 'পার্মানেন্ট লায়াব্লিটি'.... আর সেখান থেকেই মেয়ে সন্তানের প্রতি অনীহা। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, একটা সময় পর্যন্ত এই ভাবনাতে ভর দিয়ে সমাজছবির নিশ্চিন্ত রেখাচিত্র পাওয়া যেত। কিন্তু পিতৃ– তান্ত্রিকতার গভীরে বাস করেও নারী শিক্ষার প্রভূত বিস্তার ও কাজের জগতে নিজেকে প্রমাণ করার মধ্যে দিয়ে নারী নিজেকে মেলে ধরেছে। ঘরের চেনা দেওয়ালের বাইরে। আর এ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। ক্রমশ স্বাধীনতা–উত্তর ভারতে নারীর সম্পত্তিতে সমান অধিকার ও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হলে মানুষ হিসাবে তার

আত্মনির্ভরতার প্রমাণ সর্বসমক্ষে পৌঁছলেও পরিবারের এককে সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন অধরাই থেকে গেল। বরং শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করে, পিতৃ-তান্ত্রিক পরিকাঠামোর অভ্যাসটি বজায় রইল ষোলোআনা। এই অভ্যাসেরই একটি নিশ্চুপ ছায়া প্রলম্বিত হয়ে রইল পুত্র সন্তান চাওয়ার উদগ্র বাসনায়। গোটা ভারতে তো বটেই, খোদ রামমোহন রায় বিদ্যাসাগরের কলকাতায়, মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে মুখ অন্ধকার হয়ে যেতে দেখা খুব সাধারণ ঘটনা বলেই বিবেচিত হত। এতটাই সাধারণ যে, এ বিষয়ক যাবতীয় আলোচনাও ক্লিশে বলে বোধ হয়েছে এই সে দিন পর্যন্ত। ফলস্বরূপ লাফিয়ে বেড়েছে, পরিত্যক্ত মেয়ে শিশুর সংখ্যা। বেড়েছে কন্যা ভ্রূণ হত্যার ঘটনা। সঙ্গে, মাতৃ গর্ভে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য তৈরি হয়েছে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো 'কোড ল্যাংগুয়েজ'। শহর কলকাতার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিই। উত্তর কলকাতার একটি নার্সিংহোমে সেক্স ডিটেকশন অভিযোগ পেয়ে, পরখ করতে যাওয়া হয়েছিল। তারা অ্যামনিওসেনটেসিস রিপোর্টের খামের ওপর পেন্সিলে লিখে দিয়ে থাকেন, কখনো 9 কখনো 6, 9 অর্থাৎ g girl child, আর 6 অর্থাৎ b অর্থাৎ boy child। এরপর রফা হয়, কত টাকায় ও কোথায় এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভ্রূণের হত্যা সম্ভব হবে। মোটা অর্থের বিনিময়ে কন্যা সন্তানদের জন্ম আটকানোর চমৎকার ব্যবস্থা চললেও, বাইরে মোটা বোর্ডে ঝুলতে থাকে, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ শাস্তি যোগ্য অপরাধ। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এ ব্যবস্থার পাশাপাশি সোনোলজিস্ট ডাক্তারবাবুর কাছে সরাসরি আবদার, গর্ভস্থ সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে, যদি একটু জানান। অর্থ ও বিচিত্র সুবিধার আড়ালে স্পষ্ট করে না বললেও ঠারেঠোরে চলে দেওয়া-নেওয়ার খেলাটি। ইশারার মোক্ষম শব্দগুলি এখানে দারুণ ভাবে পরিচিত। ক্লিনিকের বাইরে, গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা বোঝাতে 'খুব ভালো আছে'... শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার না করে, সোনোলজিস্ট বলছেন, খুব লক্ষ্মী হয়ে আছে কিংবা 'খুব দামাল তো'... ইত্যাদি। বুঝতে বাকি থাকে না, কাঙ্খিত সত্য।

পুত্র সন্তান চাওয়ার কারণে, কেবল সেক্স ডিটেকশনের চালুনিতে যাদের যাওয়ার সুযোগ হল না, তারা যখন কন্যা সন্তান কোলে পান, সেক্ষেত্রে শুরু হয় এক অপূর্ব হিপোক্রেসি। এটি একেবারেই উত্তর আধুনিক পর্যবেক্ষণ। শহরে তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারের মানুষের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত বেশি। পুত্র সন্তানের উদগ্র বাসনায় সমাজ সংসারের ভারসাম্য হারিয়ে এদের আচরণ ক্রমাগত ক্রিমিনাল অফেন্সের আওতায় পড়ে যেতে থাকে। অথচ, আইনের ফাঁক গলে অপরাধির কাঠগড়ায় কখনোই তা পৌঁছায় না। পাঞ্জাব বা রাজস্থানে সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে মেরে ফেলার ঘটনা সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে অনেকবার। বাংলায়, সুখের কথা, সেই রকম পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু, বাংলায় যা আছে, তাকে সংখ্যাতত্ত্বের মাইক্রোস্কোপের তলায় এনে ফেলতে

মেয়ে সন্তান সংসারের কাঙ্খিত নয়, তার কারণটি আর্থিক। সোজা বাংলায় বললে মেয়েকে অর্থ ব্যয় করে বিয়ে দিতে হয়। আর্থিক চাপ পড়ে সংসারে। মেয়েরা পরনির্ভরশীল। ফলত, তার নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বীকৃতির দিকটিকে মাথায় রেখে, পরিবারের কাছে মেয়ে মানেই 'পার্মানেন্ট লায়াব্লিটি'....

সমাজকর্মীদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হবে। কারণ সমস্যা এখানে শাখা-প্রশাখা বিছিয়ে সুদূর প্রসারী। একে কেবল কন্যা ভ্রূণ হত্যার আওতায় সীমিত রাখা সম্ভব নয়। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্টের মিলিত যোগফলের প্রভাব ভয়ংকর। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো প্রাথমিক বিষয়গুলি থেকে অবাঞ্ছিত কন্যা সন্তানকে বঞ্চিত রাখা এত সূক্ষ্ম উপায়ে চলতে থাকে, যে তাকে অপরাধ বলে প্রমাণ করা বেশ শক্ত।

এই যে ভিতরে এক ও বাইরে আর এক রূপের চেহারা, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই রকম। দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে সদ্য জন্ম নেওয়া কন্যা সন্তানের বাবা সন্তান কন্যা জন্ম নেওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করলেন। সকলেই খুশি। কন্যা সন্তানের জন্ম মূহুর্তের এমন উদযাপন, কেবল কাঙ্খিতই নয়, আধুনিক চিন্তারও পরিচায়ক । এই অব্দি সকলেই আনন্দিত থাকলেন। কিন্তু এর পরের ঘটনাটি, সম্পূর্ণ অগোচরে। কন্যা সন্তান জন্ম দেবার কারণে (পড়ুন, অপরাধে) সদ্যোজাত কন্যা সমেত সিজারিয়ান মাকে পনেরো কিলোমিটার দূরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল পায়ে হেঁটে।

এমন ঘটনা আকছার ঘটছে শহর অঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলের চেহারাটা এর থেকে খুব বেশি আলাদা না। এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা মনে পড়ছে। মেদিনীপুরের জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে পরপর তিনটি মেয়ে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবারে একটি পুত্র সন্তান চাই-ই চাই। তার কারণ স্বরূপ, তারা প্রকাশ্যে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবুর কাছে স্বীকার করেন যে, তাদের যে প্রভূত সম্পত্তি আছে তার উত্তরাধিকার পরবর্তীকালে শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যে বন্টন হোক তারা তা চান না। কিন্তু বধূটির শারীরিক সক্ষমতা তখন আর সন্তান ধারণের অনুকূল নয়। সিদ্ধান্ত হয়, সারোগেট পদ্ধতিতে সন্তান আসবে। সেই মতো, শহর কলকাতাতে যোগাযোগ এবং সন্তানের জন্ম লাভ।

মনে রাখতে হবে, সারোগেসির আইন তখনও আজকের মতো এতটা পরিবর্তিত হয়নি। কাজেই, কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। কিন্তু, এবারের কাঙ্খিত সন্তানটিও মেয়ে সন্তান। এই পরিস্থিতিতে পরিবারটি সরাসরি সদ্যোজাত মেয়ে সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পীড়াপীড়িতে ও আইনের ভয় দেখিয়ে, নিমরাজি পরিবারটিকে শেষ পর্যন্ত সদ্যোজাত শিশুটিকে বাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য করা হলেও, কিছুদিন পরে এই শিশুটির আর জায়গা পরিবারে হয়নি। 'সারেন্ডার চাইল্ড' রূপে কোনও একটি সরকারি হোমে তার জায়গা হয়। এই পৌনঃপুনিক উদাহরণগুলি দেখলে আধুনিক মন সামনে হা হুতাশ করে বটে কিন্তু বাস্তবে ভেতরে ভেতরে একটি ছেলে সন্তান চাওয়ার ইচ্ছা থেকে এতটুকু সরে আসে না। আর ঠিক সে কারণেই সেক্স ডিটেকশনের নানান স্তরে ডাক্তার-রোগী আঁতাতটি চোখে পড়ার মতো। অন্য কোনও রোগ নিরাময়ের জন্য ডাক্তারের উপর রোগীর এমন নির্ভরতা তৈরি হলে আখেরে সমাজের উপকার হত। কিন্তু, তা না হয়ে ক্লিনিকের

ঠান্ডা ঘরে, ডাক্তার গাইনোকোলজিস্ট দিদিমণি যখন চেকআপের সময়ই জানান দিচ্ছেন, গর্ভস্থ সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে, তখন পরিবার পরিজন অনেক বেশি আপ্লুত ডাক্তারদিদির প্রতি। এসব ক্ষেত্রে, সন্তানের মা ছিটকে এসে কখনও কখনও তৃতীয় পক্ষের সাহায্য চান বটে, তবে সেটি চূড়ান্ত পুরুষতন্ত্র বিরোধী পদক্ষেপ । কাজেই অধিকাংশ সময় কাজের কাজ অধরাই থাকে।

ন্যা ভ্রূণ হত্যার নিরিখে, মা–এর ভূমিকাকে অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা হয়। বস্তুত আমরা দেখি সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে ত্যাগ বা গর্ভস্থ সন্তান মেয়ে জেনে ভ্রূণহত্যার মতো কাজ মা অনায়াসে করতে দেন। এখানে একটি প্রশ্ন উঠে আসে। এই যে 'অনায়াসে' শব্দটি ব্যবহৃত হল, সত্যিই কি বিষয়টি 'অনায়াসে'? কতটা মানসিক যাতনা এক্ষেত্রে অন্তরালে থাকে, তা হলপ করে বলতে পারে কোন সমাজ? মনে রাখতেই হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বড় হয়ে ওঠা মেয়েরা, মনে মনে আত্মনির্ভরশীল নয়। যুগের পরিবর্তনে কখনও কখনও আর্থিক ভাবে স্বনির্ভরতা এলেও, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরনির্ভরতার বীজ বুনে দেওয়া হয় নারীর মধ্যে শিশুকাল থেকে।

আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। মা চান না, তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া বঞ্চনা ও পীড়নের পুনরাবৃত্তি তাঁর সন্তানের জীবনে ঘটুক।

সন্তানের মধ্যে নারী জীবনের পূর্ণতা বিকাশের সুযোগ পাওয়ার রাস্তা যেখানে সম্পূর্ণ বন্ধ, সেখানে সন্তানের পৃথিবীতে আসার পথ বন্ধ করে দেওয়াই তার কাছে আশু পরিচিত পদ্ধতি! আসলে কন্যা ভ্রূণ হত্যার বাজার চলতি প্রয়োগের অনেক আগে থেকেই হত্যালীলা বীজটি উপ্ত হয়ে যায় গোপনে। তাই পরিবার পরিকল্পনার জন্য দুই সন্তানের মাকে পরামর্শ দিতে গেলে, অপমানিত হতে হয় স্বাস্থ্যকর্মীকে।

প্যারেন্টাল ডায়াগনস্টিক টেকনিক নামের আইন ভারতবর্ষে বলবৎ হয়েছে ১৯৯৬–এর জানুয়ারি থেকে। কিন্তু, সমাজছবি তথৈবচ। ১৯৯৩ সালে, 'দ্য ডিক্লেয়ারেশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন' প্রকাশ করে রাষ্ট্র সঙ্ঘ। সেখানে মেয়েরা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কেমন ভাবে নির্যাতিত হন, তার খতিয়ান পরিস্কার। শারীরিক তো বটেই, মানসিক পীড়নের পুনরাবৃত্তি একেবারেই নতুন নয়।

দীর্ঘ সময় মনে করা হত, আর্থিক স্বনির্ভরতা

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বড় একটি ধাপ। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, কেবল আর্থিক নয়, আত্ম প্রতিষ্ঠার বড় একটা দিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ও মর্যাদা। রাষ্ট্রসংঘ জেন্ডার এম পাওয়ারমেন্ট ইনডেক্স নামে এক সূচক চালু করেছে। এর দ্বারা জানা যাবে, কোথায় মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কতটা। খন্ডিত অধিকার আখেরে সমাজে তো বটেই, পারিবারিক ভাবেও বিড়ম্বিত করে নারীর অবস্থানকে। এ প্রসঙ্গে বহু আলোচিত সম্পত্তির অধিকার নিয়ে কথা বলা জরুরি। কারণ, এই বিষয়টিই বারবার আমাদের সমাজে বড় ভূমিকা নেয় নারীর অবস্থান নির্ধারণে। সতীদাহ থেকে বিধবা বিবাহ সর্বত্র সম্পত্তি সংক্রান্ত দায় ছিলই। একথা ইতিহাস স্বীকৃত। কন্যা সন্তান অবহেলা ও কন্যা ভ্রূণ হত্যার পিছনেও সেই একই ছায়া সুনিশ্চিত। মেয়ে সন্তানকে পিতার সম্পত্তি দিলে, সেটি অন্য পরিবারের করায়ত্ত হবে। এ ভাবনা থেকেই মেয়েকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রবণতা প্রবল এবং একটি ছেলে সন্তানের জন্য প্রবল আকুতি। ছেলে ও মেয়েকে একই সুবিধা দিয়ে মানুষ করার পর ছেলে সন্তান পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু, মেয়ে সন্তান নানান উপঢৌকন সমেত বিবাহ করে অন্য পরিবারভুক্ত হয়। তখন তার কাছে, পিতৃ পরিচয় ও পিতৃ পরিবারের কোনও দায় থাকে না। এই সামাজিক কাঠামোতে দাঁড়িয়ে, মেয়ে সন্তানের জন্য অনীহা স্বাভাবিক। আর এই কাঠামোর উপর নির্ভর করেই আইন যখন নারী ও পুরুষের পিতার সম্পত্তিতে সম অধিকার স্বীকার করে নেয়, তখন সামাজিক দায়ভার কেবল মেয়ে সন্তানের পিতা মাতার নয়, মেয়ে সন্তানের উপরও বর্তায় বৈকি। আর এখানেই আসে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সেই পূর্বোক্ত প্রশ্নটি।

রাষ্ট্রসংঘ উল্লিখিত জেন্ডার এমপাওয়ারমেন্টকে কাজে লাগানোর জন্য সবার আগে প্রয়োজন সার্বিক শিক্ষা। মেয়েদের লেখাপড়ার প্রসারের সঙ্গে জড়িয়ে কেবল তাদের অধিকার নয়, গোটা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। সারা পৃথিবী জুড়ে সমাজতাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে বারবার একমত। শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে বিপ্লব। বহুল প্রচলিত এই শব্দগুচ্ছ এখানে ব্যবহার না করলে আদতে আসল সত্যটি নাগালের বাইরে থেকে যেতে বাধ্য।

যুগ ব্যাপি মজ্জায় বসে থাকা সংস্কারকে উৎপাটিত করতে, চাই চেতনার আমূল পরিবর্তন। নারী পুরুষ নির্বিশেষে।

আইনের সংশোধনীতে পিতৃ সম্পত্তি গ্রহণ করলেও বহু নারী বৈবাহিক জীবনের দোহাই দিয়ে বাবা–মায়ের শেষ জীবনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চায়। আবার, একটি মেয়েকে বিবাহ–উত্তর জীবনে তার বাবা–মায়ের দায়িত্ব নিতে চাইলে নানান প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও পড়তে হচ্ছে, এমন উদাহরণ বিরল নয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোর গভীরে বেশ কিছু বিষয় লুকিয়ে আছে। যেখানে মেয়ের বাবা–মা ও ছেলের বাবা মা–র পারিবারিক অবস্থানটিও ভিন্ন। তবে, ক্রমাগত এগিয়ে চলা সময়ে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যুগে, একটি মেয়ের একক দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রটি প্রসারিত না হলে, নারী অধিকারের খন্ডিত অবয়বটিই সার হবে। সেখানে কন্যা ভ্রূণ হত্যা ও কন্যা সন্তান অবহেলার বিপরীতে সোচ্চার হওয়া কেবল একটি লোক দেখানো খেলনা হবে। সমাজমনের আয়না হয়ে কোনও দিন উঠবে না।❑

রক্তদানের নানা কথা

ডাঃ শামসুল হক
মোবাইল : ৭৫০১৭৯৪৯৬৫

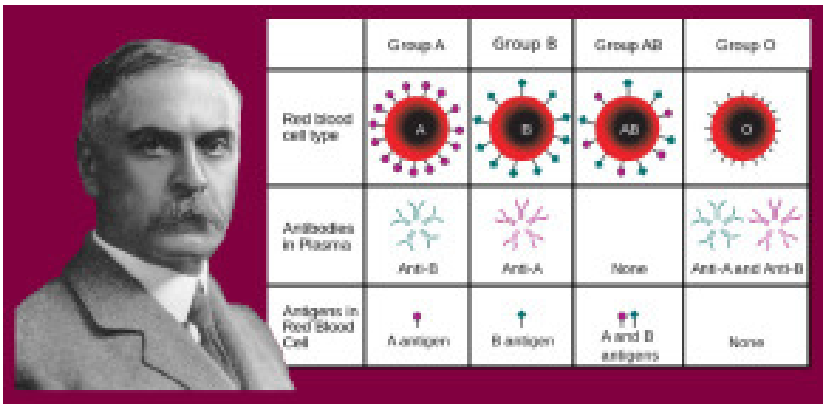

মুমূর্ষাপন্ন একজন মানুষের যদি কখনও রক্তের প্রয়োজন হয় এবং তার সাহায্যে যদি তিনি নতুনভাবে জীবন ফিরে পান তাহলে সেটা সম্ভব হয় একজন সুস্থ ও সবল মানুষের রক্তেরই বিনিময়ে। নিজের শরীরের অমূল্য সেই সম্পদ দান করে যিনি অসহায় মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেন, তাঁর সেই ইচ্ছেটাকেই অভিহিত করা হয়ে থাকে স্বেচ্ছা রক্তদান হিসেবে। সেটাকে আবার চিহ্নিত করা হয়ে থাকে সমাজ সেবার উজ্জ্বল একটা দৃষ্টান্ত হিসেবেও।

মোটামুটি শারীরিকভাবে যারা সুস্থ ও সবল এবং যাদের বয়স আঠারো বছরের অধিক তাঁরা রক্তদানের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। আর সেটা মোটেও যন্ত্রণাদায়ক নয় বলে কারও কাছে তেমন অস্বস্তিকর হয়েও ওঠে না। সূচের মাধ্যমে সেই রক্ত দেহ থেকে নেওয়া হয় এবং সময় লাগে মোটামুটি দশ মিনিট।

একজন রক্তদাতা মোটামুটি চার মাস অন্তর অন্তর এইভাবে রক্তদান করতে পারেন। এবং তার শরীর থেকে ৪৫০ মিলিলিটার থেকে ৫০০ মিলিলিটার পর্যন্ত রক্ত নেওয়া যেতে পারে।

নিয়মিত রক্তদানের সুফল

নিয়মিতভাবে রক্তদানের অভ্যাস থাকলে তাঁর দেওয়া অমূল্য সেই সম্পদ শুধুমাত্র একজনের জীবনই বাঁচায় না, নতুনভাবে বাঁচার রসদ খুঁজে পান তিনি নিজেও। কারণ এর মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকেন তিনিও।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, নিয়মিত রক্তদানের সুফল হিসেবে একজন মানুষ রক্ষা পান হৃদরোগ থেকে। থাকে না তাঁর হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও। আবার ফুসফুস, লিভার, পাকস্থলীর সমস্যা সহ ভয়াবহ কোলন ক্যান্সারের হাত থেকেও তিনি দূরে থাকতে পারেন। নিয়ন্ত্রিত থাকে রক্তচাপও।

শুধু তাই নয়, নিয়মিতভাবে রক্তদানের অভ্যাস থাকলে অতি সহজেই আবার জানা যেতে পারে রক্তদাতা জটিল ও কঠিন কোনো রোগে আক্রান্ত কি না—সেটাও। হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, সিফিলিস, গনোরিয়া, এইচ-আই. ভি., এমনকি এইডস রোগে তিনি আক্রান্ত কিনা, নিশ্চিতভাবেই জানা যাবে সেটাও। কারণ কারও শরীর থেকে রক্ত নেওয়ার আগেই পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় সেটাও।

রক্তদান এবং প্রাথমিক পর্যায়ে নানান বিভ্রান্তি

একজন সুস্থ মানুষের রক্ত অসুস্থ অন্য জনের দেহে প্রয়োগের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল নতুনভাবে, বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখাও। কিন্তু সেটা নিয়ে প্রথমে দেখা দিয়েছিল নানান বিভ্রান্তি এবং অতি অবশ্যই হরেক ধরনের কুসংস্কারও। আর তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিক থেকেই এসেছিল অনেক বাধাও। কিন্তু তবুও চলেছিল রক্ত দেওয়া নেওয়ার কাজও। প্রাথমিক পর্যায়ে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের কোনো প্রথা চালু ছিল না বলে অনেক ক্ষেত্রেই নানান অসুবিধার সৃষ্টিও অবশ্য হয়েছিল। ঘটেছিল মৃত্যুর ঘটনাও।

সেইভাবেই কেটে গিয়েছিল বেশ কয়েকটা বছরও। অবশেষে তার পরিবর্তন আসে এবং শুরু হয় রক্তের গ্রুপ নির্ণয় প্রথা এবং তারপর থেকে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সেটা ভীষণ গ্রহণযোগ্যও হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে মানুষের মন থেকেও মুছে যায় সব ধরনের কুসংস্কারের ছবিও।

পরবর্তী সময়ের সুফল

নতুনভাবে বাঁচতে চেয়ে নিজের শরীরে অন্যের রক্ত চালান করার ইচ্ছেটাও তারপর বাড়তে থাকে ভীষণ দ্রুত গতিতেই। ফলে দিনের পর দিন বাড়তে থাকে রক্তের চাহিদাও। আর, সেই চাহিদা একেবারে চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। আর তখন শুধুমাত্র চাহিদাই নয়, প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেই রক্ত। কোথায় সংরক্ষিত থাকবে তার ফলে সেটা নিয়ে শুরু হয় অনেক চিন্তাভাবনাও।

অবশেষে বেলজিয়ামের তরুণ চিকিৎসক অ্যালবার্ট হার্ডস্টিল তার উপায় উদ্ভাবন করেন। রক্তের সঙ্গে সোডিয়াম নাইট্রেট মিশিয়ে

সাময়িকভাবে তিনি সেই সমস্যার সমাধান করেন। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি গবেষণার কাজ। বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বিভিন্ন দেশের চিকিৎসক এবং গবেষকরা মিলিতভাবে তার স্থায়ী সমাধানের উপায় বের করেন।

রক্ত সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক গঠনের পরিকল্পনা

এরপরই সামনে চলে আসে রক্ত সঞ্চয়ের প্রসঙ্গটিও। আর সেজন্যই ভাবা হয় ব্লাড ব্যাঙ্ক গঠনেরও। মাথা ঘামানো শুরু হয় সেই বিষয়েও। একটা সময়ে সেটা তৈরিও হয়ে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতেই। আর সেখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক শ্রেণীর মানুষ নিয়মিত রক্ত দিতেও শুরু করেন। একটা সময়ে তো সেইসব রক্তদাতারা সেটাকে নিজস্ব একটা পেশা হিসেবেই বেছে নিয়েছিলেন। তাই রক্ত সংগ্রহের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় হলেও মালিক পক্ষের ব্যবসা কিন্তু তখন বেশ জমেই উঠেছিল।

অসাধু ব্যবসায়ীদের অসৎ পরিকল্পনা

কিন্তু তা হলে কী হবে, তাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁরা। দিনের পর দিন বেড়ে চলছিল লোভও। তাই একটা সময় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অন্যভাবে রক্ত সংগ্রহের ফন্দিটাও খুঁজে নিয়েছিলেন। হার্টের বিভিন্ন অসুখে অথবা ইলেকট্রিক শক খেয়ে মৃত্যু হত যে সমস্ত মানুষের, কিছু অসাধু চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীদের সহায়তায় সেই সব মৃত মানুষদের দেহ থেকে অতি গোপনেই রক্ত নিংড়ে নিতেন তাঁরা। উল্লেখ্য, সেই রক্ত যদি মৃত মানুষদের দেহ থেকে মোটামুটি, পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টার মধ্যে বের করে নেওয়া হয়, তাহলে সেটা যে ব্যবহারের উপযোগী হবে, সেটাও জানা ছিল তাদের। তাই সেইসময় নানান অসৎ পথ অবলম্বন করেই বেশ কিছু ব্লাড ব্যাঙ্কের মালিক ফুলে ফেঁপেও উঠেছিলেন। তখন থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া সহ আরও কিছু রোগীদের যখন তখনই রক্তের প্রয়োজন হত। তাই মালিক পক্ষের ব্যবসার কাজও বেশ সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। আর সেইভাবে চলতে চলতেই একটা সময় সেইসব, প্রাইভেট সংস্থাগুলো নিজেদের ব্যবসার স্বার্থেই রূপান্তরিত হয়েছিল ট্রান্সফিউশন ইন্ডাস্ট্রিতে। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। একসময় সব সংবাদই পৌঁছে

“নিয়মিত রক্তদানের সুফল হিসেবে একজন মানুষ রক্ষা পান হৃদরোগ থেকে। থাকে না তাঁর হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও। আবার ফুসফুস, লিভার, পাকস্থলীর সমস্যা সহ ভয়াবহ কোলন ক্যান্সারের হাত থেকেও তিনি দূরে থাকতে পারেন। নিয়ন্ত্রিত থাকে রক্তচাপও।”

যায় সরকারের কানে। আর তারপর থেকেই সাধারণ মানুষজনের কথা ভেবেই শুরু হয় সরকারি তৎপরতাও।

সরকারের হস্তক্ষেপ এবং দেশের সব স্থানেই বিনামূল্যে রক্তদান কর্মসূচির সূচনা

রক্তদান কর্মসূচিকে নতুন রূপে রূপান্তরিত করার জন্য তারপরই শুরু হয় সরকারের জোর তোড়জোড়ও। সব দেশই তখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনও করে। আর তারই ফলস্বরূপ সব স্থানের সব ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোই সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানেই চলে আসে। আর এই ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে সুইজারল্যান্ড। সেই দেশই প্রথম চালু করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রক্তদান। বিশ্বের অন্যান্য দেশও তারপর সেই পথ অনুসরণ করে এবং একটা সময় রক্ত নিয়ে বন্ধ হয় নানান ধরনের অসাধু ব্যবসাও।

পিছিয়ে ছিল না আমাদের রাজ্যও

আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যও সেই বিষয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রয়াস শুরু হয়। ১৯৬২ সালে। কলকাতার স্টুডেন্টস হেলথ হোমের নেতৃত্বে শুরু হয় বিনামূল্যে রক্তদান করার প্রয়াস। বর্তমানে স্বেচ্ছা রক্তদানের উদ্যোগে আমাদের রাজ্য অনেক এগিয়েও আছে। আর এই ব্যাপারে কলকাতার তো কোনো তুলনাই হয় না।

উপসংহার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে এখন পালন করা হচ্ছে বিশ্ব রক্তদান দিবস। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর জুন মাসের ১৪ তারিখে সমগ্র বিশ্বব্যাপী বেশ সাড়ম্বরে পালিত হয়ে চলেছে সেই দিবস। রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং সেই বিষয়ের উপরই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার বিরল সম্মানের অধিকারী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার সাহেবের কথা মনে রেখেছেন সমগ্র বিশ্বের স্বাস্থ্য সচেতন মানুষজন এবং বিশেষজ্ঞ মহল। তাই ১৪ই জুন তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখে সেই দিনই সমগ্র পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়ে আসছে সেই অনুষ্ঠান। ❑

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিপা ভাইরাসের উৎস মূলত বাদুড়। বাদুড়ের আধ–খাওয়া ফল ভালো ফলের সঙ্গে মিশে থাকলে সেখান থেকেও ছড়াতে পারে এই ভাইরাস। আক্রান্তের ব্যবহৃত বিছানা, পোশাক বা অন্যান্য জিনিসপত্র থেকেও সংক্রমণের ক্ষমতা রাখে নিপা ভাইরাস। সাধারণ ভাইরাল জ্বরের মতো উপসর্গ হলেও নিপা ভাইরাসে মৃত্যুহার ৫০–৬০ শতাংশ।

নিপা ভাইরাস নিয়ে অযথা আতঙ্ক নয়

অন্বেষা গাঙ্গুলী
(মাইক্রোবায়োলজিস্ট)
মোবাইল : ৯৭৭৫৭৩৬৯২২

নিপা ভাইরাস নিয়ে রাজ্যজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাজ্যের সীমান্তের জেলাগুলোতে অবিলম্বে নিপা পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম থেকেই ছড়িয়েছে নিপা সংক্রমণ। রাজ্যে নিপা আক্রান্ত নার্সের সংস্পর্শে ৪৮ জনকে ঘরবন্দি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অযথা আতঙ্কিত হবেন না। সচেতন থাকতে হবে। যেটা জানা গেছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে ভারত–বাংলাদেশের সীমানাঘেঁষা গ্রাম থেকে ছড়িয়েছে নিপা। আক্রান্ত ২৫ বছরের এক নার্স পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গত ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর ওই গ্রামে যান। সেখানকার মানুষের কাঁচা খেজুরের রস ও গুড় খাওয়ার অভ্যাস আছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেখানে গিয়েই তরুণী সংক্রামিত হন। এবারের নিপা সংক্রমণ নিয়ে কল্যাণী এইমসের পাঠানো রিপোর্টে এ কথারই উল্লেখ রয়েছে। তরুণ–তরুণীর দেহরসের নমুনা পরীক্ষা করে সেখানকার বিশেষজ্ঞরা ১১ পাতার রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ফলখেকো বাদুড়ের (ফ্রুট ইটিং ব্যাট) অন্যতম প্রিয় খাদ্য খেজুরের রস। অনেক ক্ষেত্রে রস খাওয়ার সময় সেখানে বর্জ্য ত্যাগ করে সে। সেই রস থেকে মানবদেহে সংক্রমণ হতে পারে। প্রতিবেশী দেশ সংলগ্ন (ঠিক উল্টোদিকে বাংলাদেশের চুয়াডাঙা, একটু দূরে কুষ্টিয়া) বিস্তীর্ণ এলাকায় এভাবেই নিপা সংক্রমণ হচ্ছে এক যুগ ধরে। ইনফ্রারেড ক্যামেরায় বাদুড়ের ওই কীর্তিকলাপ ধরা পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' জানিয়েছে, ২০০১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩৪৭ জন নিপায় সংক্রামিত হয়েছেন। ফি বছর সংক্রমণ হচ্ছে। মৃত্যুহার প্রায় ৭২ শতাংশ। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কলকাতায় এসেছেন এনআইভি পুনের বিজ্ঞানীরা। পুরো বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখছেন। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে তৈরি হয়েছে নিপা ওয়ার্ড। এদিকে বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেছেন, 'সব মিলিয়ে মোট ৪৮ জনকে কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। টানা ২১ দিন তাঁদের ঘরবন্দি থাকতে হবে। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। গোটা ঘটনাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বর্ধমান মেডিকেলে চারটি আইসোলেশন বেড প্রস্তুত করা হয়েছে। কারও উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসা শুরু হবে। প্রয়োজন মতো বেডের সংখ্যা বাড়ানো হতে পারে। এপর্যন্ত রাজ্যে একজন নার্স সহ দু'জনের শরীরে নিপা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। নার্সের পরিবার সূত্রে খবর, গত ৩০ ডিসেম্বর তাঁর জ্বরের উপসর্গ দেখা দেয়। তিনি বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মরত। ৩১ ডিসেম্বর জ্বর গায়েই তিনি কাজ

করেন সেখানে। ২ জানুয়ারি তাঁর বাবা হাওড়া স্টেশন থেকে মঙ্গলকোটের বাড়িতে নিয়ে আসেন। ওই দিনই কাটোয়া শহরের সার্কাস ময়দানের এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। ভোর রাতে তিনি বাড়িতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ৩ জানুয়ারি গ্রামেরই একটি গাড়ি করে নার্সকে তড়িঘড়ি কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দু-ঘন্টা থাকার পরেই তাঁকে বর্ধমান মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা আছে। তার মধ্যে ৩৪টি জেলাতেই নিপা ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত। ২০০১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত নিপা ভাইরাসের সংক্রমণের ইতিহাস অন্তত তাই বলছে। এই ৩৪টি জেলার মধ্যে বাংলাদেশের এক ডজনের বেশি জেলার সীমানা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। সীমানার এপারে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলা। দুই ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার।

নীলরতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ পীতবরণ চক্রবর্তী জানান, প্রত্যেক মানুষকে এই ভাইরাস সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। ভাইরাসের কারণ ও নির্মূল করার বিষয়টিতে ওয়াকিবহাল হলে অযথা ভয় পাবার কিছু নেই। কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হবে। আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুব্রত ঘোষ জানান, শিশুদের নিয়ে মায়েদের সচেতন থাকতে হবে। বিশেষ করে খাবারের বিষয়ে। তবে আতঙ্কের কিছু নেই।

নিপা ভাইরাসের উৎস

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিপা ভাইরাসের উৎস মূলত বাদুড়। বাদুড়ের আধ-খাওয়া ফল ভালো ফলের সঙ্গে মিশে থাকলে সেখান থেকেও ছড়াতে পারে এই ভাইরাস। আক্রান্তের ব্যবহৃত বিছানা, পোশাক বা অন্যান্য জিনিসপত্র থেকেও সংক্রমণের ক্ষমতা রাখে নিপা ভাইরাস। সাধারণ ভাইরাল জ্বরের মতো উপসর্গ হলেও নিপা ভাইরাসে মৃত্যুহার ৫০-৬০ শতাংশ। আক্রান্তের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাই তাঁকে সুস্থ করতে পারে। সে জন্য দ্রুত রোগ ধরা পড়া অত্যন্ত জরুরি। নিপাকে বিজ্ঞানীরা বলেন জুনটিক ভাইরাস। অর্থাৎ পশুর শরীর থেকে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢোকে। আক্রান্ত পশুদের দেহের অবশিষ্টাংশ, বা মলমূত্র থেকে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

“সাধারণ পরীক্ষায় নিপার সংক্রমণ ধরা পড়ে না। বায়ো-সেফটি লেভেল-থ্রি স্তরের কোনও ল্যাবরেটরিতেই নিপা ভাইরাসের পরীক্ষা করা সম্ভব। কারণ, এই স্তরের ল্যাবরেটরি না হলে যিনি পরীক্ষা করবেন তাঁরও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।”

রোগ নির্ণয়

সাধারণ পরীক্ষায় নিপার সংক্রমণ ধরা পড়ে না। বায়ো-সেফটি লেভেল-থ্রি স্তরের কোনও ল্যাবরেটরিতেই নিপা ভাইরাসের পরীক্ষা করা সম্ভব। কারণ, এই স্তরের ল্যাবরেটরি না হলে যিনি পরীক্ষা করবেন তাঁরও আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আক্রান্তের থুতু-লালা, মূত্রের নমুনা বা সেরিব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইড থেকেই নিপা ভাইরাস চিহ্নিত করা সম্ভব।

প্রতিরোধে ব্যবস্থা

বিপজ্জনক এই ভাইরাসের মোকাবিলা করতে টিকাই একমাত্র উপায় হতে পারে। জেনোভার প্রতিষেধক কাজ করলে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচবে বলেই আশা করছেন গবেষকেরা। চিকিৎসক পীতবরণ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘নিপা ভাইরাস থেকে বাঁচতে হলে আগে আমাদের সচেতন হতে হবে। বাজার থেকে ফল নেওয়ার সময় ভালো করে দেখে কিনতে হবে। মাঠেঘাটে পড়ে থাকা ফল না খেলেই ভালো। মাংস বেশি সময় ধরে রান্না করলে, আগুনের তাপে জীবাণু মরে যায়। ফলে জীবাণু বা ভাইরাস ঘটিত রোগের হাত থেকে সহজেই রেহাই পাওয়া যায়। নিপা ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হলে ৭৫ শতাংশ বাঁচার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই আগে থেকে আমাদের সতর্ক হতে হবে।!’’

রোগ ঠেকাতে যেটা করবেন, যেখানে রোগ হয়নি সেখানে সাধারণ ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে যে সব নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়, যেমন— পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর ভাবে থাকা, নাকে-মুখে হাত দেওয়ার আগে বা খাবার খাওয়ার আগে হাত ভালো করে ধুয়ে নেওয়া ইত্যাদি। সেটুকু মানলেই চলে। তবে যেখানে রোগ হচ্ছে সেখানে তার সঙ্গে আরও কয়েকটি নিয়ম মানা জরুরি। যেমন—শুয়োরের থেকে সব রকম দূরত্ব বজায় রাখা, সমস্যা না মেটা পর্যন্ত ফল খাওয়া বন্ধ করা, ঘরে পরিচ্ছন্ন ভাবে বানানো সুসিদ্ধ খাবার খাওয়া, রাস্তাঘাটে বেরোনোর সময় মাস্ক পরে নেওয়া। এন ৯৫ মাস্ক পরে নিলে বিপদের আশঙ্কা কম থাকে। রোগীর সেবা যাঁরা করেন তাঁদের মাস্ক পরা ও হাত ধোয়ার ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। তাহলেই আমরা সকলে সুস্থ থাকব। তবে নিপা বা যে কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন। কিংবা কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যান। ❑

ঠান্ডায় ত্বকের সমস্যা ও রেহাই

ডাঃ শান্তনু গাঙ্গুলি
(বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক)
মোবাইল : ৯৯০৩১৫২৯৮৪

অনেকের ধারণা এই যে, ত্বক বা চর্ম গাত্রাবরণ মাত্র, কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্তিমূলক, কেন না ত্বক শরীরের বা শারীরিক যন্ত্রের আবরণ মাত্র নয়, বস্তুত হৃদপিন্ড, পাকাশয়াদির মতো এটাও প্রাণীদেহের একটি সক্রিয় যন্ত্র। চর্মরোগ সাধারণত অভ্যন্তরিণ দেহযন্ত্রের কোনো রোগের বাহ্যপ্রকাশ মাত্র। সুতরাং এটা নিরাময় করতে হলে সাধারণত অভ্যন্তরিণ ওষুধ খাওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। তবে শীতকালে বায়ু ও পরিবেশ দূষিত হয়ে দুই একটি চর্মরোগ যা শরীরে ময়লা ইত্যাদি জমে উৎপন্ন হয়, সেগুলো ওষুধর বাহ্যপ্রয়োগে প্রশমিত করলে কোনো ক্ষতি হয় না।

শীতকালীন ত্বকের সমস্যা, যেমন শুস্কতা, চুলকানি, ঠোট ফাটা, একজিমা এবং নানা প্রকারের চর্মরোগ ঠান্ডা বাতাসের আক্রমণ থেকে উদ্ভুত হয়। এসব সমাধানের মধ্যে রয়েছে হালকা ক্লিনজার, ঘন ময়েশ্চারাইজার (গ্লিসারিন ইত্যাদি), অল্প সময় ধরে হালকা গরম জলে স্নান করা, হাইড্রেটেড থাকা, হিউমিডিটিফায়ার ব্যবহার করা, টুপি বা গ্লাভস দিয়ে ত্বককে বাতাস থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। মৃদু এক্সফোলিয়েশন এবং রোদ থেকে সুরক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে দীর্ঘস্থায়ী গুরুতর সমস্যার জন্য চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ প্রয়োজন।

> **“ কম আর্দ্রতার কারণে ত্বকের প্রাকৃতিক তেলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে ত্বকের ওপরের আস্তরণে খোসা ছেড়ে যেতে পারে। এতে আক্রান্ত স্থানে জ্বালা অনুভূত হয়। ”**

শীতে ত্বকের সাধারণ সমস্যা

• **শীতে ত্বকের শুস্কতা এবং খোসা ছাড়ানো :** ত্বক টানটান এবং নিস্তেজ বোধ করে। এবং কম আর্দ্রতার কারণে ত্বকের প্রাকৃতিক তেলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে ত্বকের ওপরের আস্তরণে খোসা ছেড়ে যেতে পারে। এতে আক্রান্ত স্থানে জ্বালা অনুভূত হয়।

• **ঠোঁট ফাটা :** ঠোঁট চাটলে প্রায়শই ঠোঁট শুস্ক হয়ে ফেটে যায় এবং ব্যথা বোধ হয়।

• **একজিমা ও ডার্মাটাইটিস :** চুলকানি, লাল স্ফীত দাগের সাথে বিদ্যমান অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে।

• **শীতকালীন চুলকানি:** তীব্র চুলকানির সৃষ্টি হয় আবার কখনও কখনও এটা হয় ফুসকুড়ি ছাড়াই। এবং এই অবস্থার অবনতি হলে তা অন্তর্নিহিত জটিল সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে থাকতে পারে।

• **বাতাসে পোড়া :** ঠান্ডা বাতাসে ত্বক লাল হয়ে যাওয়া থেকে জ্বালা-পোড়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সমাধান ও প্রতিরোধ

• **ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন :** ভেজা ত্বকে স্নানের পরে হালকা ক্রিম (পেট্রোলিয়াম জেলি, গ্লিসারিন) ত্বকে প্রয়োগ করুন। এতে ত্বক স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে।

• **মৃদু ক্লিনজার ব্যবহার করুন :** বেশি গরম জলের ব্যবহার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। হালকা সুগন্ধি যুক্ত, সালফেট যুক্ত বডিওয়াশ ও ফেসওয়াশ ব্যবহার করা যেতে পারে।

• **স্নানের অভ্যাস ব্যালেন্স করুন :** হালকা গরম জলে স্নান করুন ও অতিরিক্ত ধোঁয়া ও ধুলোযুক্ত পরিবেশ এড়িয়ে চলুন।

• **অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে শরীর হাইড্রেট করুন :** প্রচুর জল পান করুন। ঘরের ভেতর একটি হিউমিডিফায়ার (শতকরা ৩০ থেকে ৫০ ভাগ, আর্দ্রতার ওপর সেট করে) ব্যবহার করতে পারেন। গ্লাভস, স্কার্ফ এবং টুপি ব্যবহার করুন। এবং পেট্রোলিয়ামের লিপবাম প্রয়োগ করে প্রতিদিন সানস্ক্রিন লাগান।

• **মৃদু এক্সফোলিয়েশন :** মরা চামড়া অপসারণের জন্য নরম ওয়াশ ক্লথ বা মৃদু স্ক্রাব ব্যবহার করুন। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ত্বকের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

• **খাদ্যাভ্যাস ও মানসিক চাপ :** ওমেগা-৩, প্রোটিনযুক্ত খাবার গ্রহণ এবং ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে অতিরিক্ত টেনশন এড়িয়ে চলুন। মানসিক শান্তি ও উৎফুল্লতা বজায় রেখে চলুন, কারণ অতিরিক্ত স্ট্রেস ত্বকের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

• যদি চুলকানির তীব্রতা বেশি হয় ও এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয় অথবা আপনি ত্বকে কোনো ঘা লক্ষ করে থাকেন।

• একজিমা, সোরিয়াসিস বা সন্দেহজনক ফ্রস্টবাইট যদি দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুতর আকার ধারণ করে, সেক্ষেত্রে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি।

শীতের ত্বকের সমস্যায় হোমিওপ্যাথিক সমাধান

শীতকালীন ত্বকের সমস্যা যেমন শুষ্কতা, চুলকানি ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য ব্যক্তির নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখে হোমিওপ্যাথিক প্রতিকার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য একজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

> **“ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে অতিরিক্ত টেনশন এড়িয়ে চলুন। মানসিক শান্তি ও উৎফুল্লতা বজায় রেখে চলুন, কারণ অতিরিক্ত স্ট্রেস ত্বকের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে।”**

শীতের ত্বকের সমস্যায় হোমিওপ্যাথিক প্রতিকার

• **পেট্রোলিয়াম :** প্রায়শই খুব রুক্ষ, শুষ্ক ত্বকের জন্য এবং হাত-পা ফাটার জন্য কার্যকর।

• **গ্রাফাইটিস :** শুষ্ক, রুক্ষ এবং ফাটা ত্বকের জন্য জন ভালো।

• **সালফার :** চুলকানি প্রায়শই রাতে এবং গরমে ও ঠান্ডায় শোয়ার সময় উপসর্গগুলো আরও গুরত্বপূর্ণ হয়।

• **আর্সেনিকাম অ্যালবাম :** খুব শুষ্ক, আঁশযুক্ত ত্বকের জন্য খুবই কার্যকরি যার সাথে প্রচন্ড জ্বালা এবং চুলকানি থাকে। ঠান্ডা বাতাসে রোগের বৃদ্ধি।

• **রাসটক্স :** ফুসকুড়ি বা আমবাত সৃষ্টি করে যা তীব্র চুলকানি হয়। উষ্ণতা এবং নড়াচড়ায় ভালো বোধ হয়।

• **ক্যালেন্ডুলা অফিসিনাসিস :** জ্বালা, চুলকানি এবং শুষ্ক, ফাটা ত্বকের চিকিৎসার জন্য। ক্রিম বা মলমে মিশিয়ে টপিক্যালি ব্যবহৃত হয়।

• **মেজেরিয়াম :** শুষ্ক, খসখসে এবং চুলকানি যুক্ত চামড়ার জন্য বিশেষভাবে কার্যকরি। রোগী ঠান্ডা বাতাসে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং চুলকানির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

উপরোক্ত হোমিওপ্যাথিক প্রতিকারগুলো ত্বকের যত্নের সাথে সাথে, ভালো অভ্যাসের সাথে মিলিত হলে আমরা ভালো কাজ পেতে পারি। তেমনি বেশি ক্ষারযুক্ত সাবান এড়িয়ে চলা এবং ঠান্ডা লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুরক্ষামূলক আবরণ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

সঠিক ডোজ এবং প্রতিকার নির্বাচনের জন্য সর্বদা একজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ❑

সুস্বাস্থ্য প্রকাশনী

ডাঃ কৌশিক লাহিড়ী'র

ত্বক নিয়ে ঝকমারি

ঝকমারিহীন
ঝকঝকে
ত্বকের আশ্বাস

দাম : ১০০ টাকা

সুস্বাস্থ্য প্রকাশনী

কোন খাবার, কতটা এবং কখন খাবেন

কমলা আদক
(প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
মোবাইল : ৮৭৭৭০৮৮২৯৫, ৯৮৩০১৫১৪৭৬

সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিন সঠিক সময়ে খাবার ন খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত দিনে তিনটি প্রধান খাবার (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার) এবং মাঝে ১–২টি হালকা মাল খাওয়া উচিত।

কখন খাবেন

সকালের খাবার

সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে খাওয়া আদর্শ। ঘুম থেকে ওঠার এক ঘণ্টা পর কিছু খেয়ে নেওয়া ভালো।

দুপুরের খাবার

দুপুর ১টা থেকে ২ টোর মধ্যে হওয়া উচিত। সকালের খাবার ও দুপুরের খাবারের মধ্যে ৪–৫ ঘণ্টার ব্যবধান রাখা ভালো।

রাতের খাবার

রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে খাওয়া উচিত। এবং ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত দুঘণ্টা আগে খাওয়াভালো।

হালকা স্ন্যাক্স

সকাল ১০টা থেকে ১২টা নাগাদ এবং বিকেল ৪টে থেকে ৫টা নাগাদ হালকা স্ন্যাক্স যেমন ফল, অঙ্কুরিত ছোলা, বাদাম ইত্যাদি খাওয়া যায়। এটি হজমে সহায়তা করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে।

খাবারের উপাদান

ভিন্ন আমাদের খাবার হবে সুষম। প্রতিদিনের টা খাবারে সব ধরনের খাদ্য উপাদান থাকা উচিত। মোটামুটিভাবে খাবারের ছটি উপাদান—

- **শর্করা :** যেগুলো আমাদের এনার্জি দেয় (ভাত, রুটি)।
- **প্রোটিন :** মাছ, মাংস, ডাল, ডিম, সয়াবিন প্রভৃতি। এগুলো মূলত টিস্যুর বৃদ্ধি এবং মেরামতে সাহায্য করে। কার্বোহাইড্রেটের সরবরাহ যদি পর্যাপ্ত না থাকে তখন শক্তির জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **ফ্যাট (তেল বা ঘি) :** শক্তির ঘনীভূত উৎস হিসেবে, কাজ করে। নির্দিষ্ট ভিটামিন শোষণ এবং কোষের গঠনের জন্য অত্যন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ।
- **ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ :** বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফলে ভিটামিন ও খনিজ আছে যেগুলো রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- **ফাইবার :** হজমে সাহায্য করে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- **জল :** সারাদিনে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পানকরা উচিত।
- অতিরিক্ত চিনি, লবণ ও অস্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার কম খেতে হবে বা এড়িয়ে চলতে হবে।
- খাবারের পরিমাণ বয়স ও শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে তবে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজদ্রব্যের ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। এই খাদ্যগুলো সারাদিনের শক্তি ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেয়, শরীরকে সুস্থ ও কর্মঠ রাখে।
- শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখত্বে প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম করা জরুরি।
- সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিনের খাবারে বৈচিত্র রাখা জরুরি। যেখানে মিষ্টি মুলো, গাজর, পালংশাকের মতো সবজি এবং বাদাম, শিম, অপ্রক্রিয়াজাত শস্যদানা (লাল চাল, ওট, যব) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সারাদিনের সুষম খাদ্যের তালিকা

সকালের নাস্তা বা টিফিন

- **শর্করা :** রুটি, পাউরুটি, ওট, সুজি।
- **প্রোটিন :** ডিম, দুধ বা দই। ফল ও কিছু সবজির তরকারি।

দুপুরের খাবার

- **শর্করা :** ভাত, রুটি বা পরোটা।

● **প্রোটিন :** ডাল, মাছ বা মাংস (সয়াবিন, পনির নিরামিষাশীদের জন্য)।

● **শাক–সবজি :** তরকারি বা স্যালাড হিসেবে।

● **স্বাস্থ্যকর ফ্যাট :** কম তেল ব্যবহার (তরকারি হিসেবে)।

● **ফাইবার :** শস্যদানা যা হজমের জন্য উপাকরি।

<u>বিকেলের নাস্তা বা টিফিন</u>

● ফল, বাদাম প্রভৃতি।

রাতের খাবার

দুপুরের খাবারের মতো সুষম খাদ্য রাখতে হবে। তবে কম কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) খেতে হবে।

● সারাদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করতে হবে।

এই তালিকা একটি সাধারণ নির্দেশিকা । বয়স, লিঙ্গ, ওজন এবং শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী পুষ্টির চাহিদা ভিন্ন হতে পারে। তাই সব দিক বিবেচনা করে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে।

সুষম খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট শক্তি সরবরাহ এবং বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার্বোহাইড্রেট বলতে শুধু ভাত, রুটি অর্থাৎ চাল ও গম জাতীয় শস্যই নয়, আরও কয়েকটা উচ্চ–কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের উল্লেখ করছি—

■ **মিষ্টি আলু :** পুষ্টির একটি শক্তিশালী উৎস। জটিল কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ভিটামিন–এ এবং সি, পটাসিয়ামের মতো খনিজ পদার্থে ভরপুর । এগুলো টেকসই শক্তি সরবরাহ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

■ **ওটস :** এটি সম্পূর্ণ শস্যজাতীয় শস্য যা তাদের উচ্চফাইবার এবং জটিল কার্বোহাইড্রেটের জন্য পরিচিত। এটি শক্তির একটি দুর্দান্ত উৎস এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এতে ভিটামিন বি–১, ম্যাগনেসিয়াম এবং আয়রনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানও আছে। সকালের নাস্তায় ব্যবহার করা ভালো।

■ **কলা :** পুষ্টিকর, উচ্চ কার্বোহাইড্রেট যুক্ত ফল। পেশির কার্যকারিতার জন্য পটাসিয়াম এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য ভিটামিন–বি৬ সমৃদ্ধ। সকালে ওটমিলের সাথে বা ফল হিসেবে খাওয়া যেতে পারে।

■ **শিম এবং মুসুর ডাল :** এগুলো জটিল কার্বোহাইড্রেট। ফাইবার এবং উদ্ভিদ ভিত্তিক প্রোটিনের চমৎকার উৎস। এগুলোতে আয়রন,

“খাবারের পরিমাণ বয়স ও শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে তবে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজদ্রব্যের ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। এই খাদ্যগুলো সারাদিনের শক্তি ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেয়, শরীরকে সুস্থ ও কর্মঠ রাখে।”

ফোলেট এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ আছে। এগুলো রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং হজমের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

■ **ব্রাউন রাইস বা বাদামী চাল :** সম্পূর্ণ শস্যজাতীয় চাল যা জটিল কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ এবং সিলেনিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টির একটি স্বাস্থ্যকর মাত্রা প্রদান করে। এর পুষ্টিগুণ সাদা চালের থেকে বেশি।

■ **বেরি :** স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি এবং ব্লাকবেরি ফলগুলো কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন–সি সমৃদ্ধ। এগুলো প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শুধু খাওয়া যায়, দই এবং স্যালাডে যোগ করা যায়।

■ **বিটরুট :** প্রাকৃতিক ভাবে মিষ্টি। এতে আছে কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ফোলেট, ম্যাঙ্গানিজ এবং পটাসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ। এছাড়াও বেটালাইন নামক ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট আছে যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ বিরোধী। এটি কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যেতে পারে।

■ **পুরো শস্য রুটি :** সাদা রুটির বদলে হোলগ্রেন রুটিতে আরও বেশি ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে যা টেকসই শক্তি জোগায় ও হজমে সাহায্য করে।

বিকল্প কার্বোহাইড্রেটগুলো বিভিন্ন স্বাদ ও

রন্ধনসম্পর্কীয় সম্ভাবনা প্রদান করে। ব্যক্তিগত চাহিদা ও পছন্দ অনুসারে, বৈচিত্রময় পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের অংশ হিসেবে উপভোগ করা যেতে পারে।

দৈনিক কতটা খাবার খাওয়া উচিত

• **চাল, আটা, ভুট্টা ও দানাযুক্ত খাবার :** পুষ্টিবিদদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্কমানুষের দৈনিক প্রায় ২৭০ থেকে ৪৫০ গ্রাম খাবার খাওয়া উচিত। এই খাদ্য তার দেহের স্বাভাবিক গঠনেব্যাপক প্রভাব রাখে। শুধুমাত্র খিদে নিবারণের জন্য নয়।

• **শাকসবজি :** প্রতিটি মানুষের শাকসবজি খাদ্যতালিকায় ৩০০ থেকে ৬০০ গ্রাম শাকসজি খাওয়া জরুরি। এতে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

• **প্রোটিন :** প্রাণীজ প্রোটিন মাছ, মাংস, ড্রিম, দুধ সর্বোৎকৃষ্ট। নিরামিষাশীরা সয়াবিন ও পনির থেকে প্রোটিন সংগ্রহ করবেন। তবে দৈনিক খাদ্য তালিকায় ১৫০ গ্রাম থেকে ৩৫০ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য রাখা উচিত।

• **তেল ও চর্বিজাতীয় খাবার :** এটা কম খাওয়া উচিত। তবে স্বাভাবিক সুস্থতার জন্য প্রতিদিন অন্তত ৩০–৪৫ মিলিমিটার তেল ও চর্বি খাদ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

• **ডাল জাতীয় খাবার :** ডাল মানুষের শরীরের বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ঘাটতি পূরণে সহায়ক। সুষম খাদ্য হিসেবে ৩০ থেকে ৬০ গ্রাম ডাল পুষ্টিকর খাবারের তালিকায় রাখতে হবে।

• **দুধ :** শরীরের ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ও সুস্থতায় দুধের বিকল্প নেই। তাই খাদ্যতালিকায় দুধ ও দুধ জাতীয় খাবার দৈনিক ১৫০ থেকে ৪৫০ মিলি লিটার অবশ্যই রাখতে হবে।

> **“স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি এবং ব্লাকবেরি ফলগুলো কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন–সি সমৃদ্ধ। এগুলো প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।”**

• **ফলমূল :** ভিটামিনের অন্যতম উৎস ফলমূল। প্রতিদিন অন্তত ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম ফল দৈনিক খাবার হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। যা সুস্থতার স্বার্থে আবশ্যক ।

• **সুগার :** কম খাওয়াই ভালো। সুস্থতার জন্য দৈনিক ২০–২৫ গ্রাম, চিনি যথেষ্ট।

দৈনিক এই পুষ্টিকর খাবারগুলো খেলে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় থাকবে।

দৈনিক সুষম খাদ্যগুলো নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিত পরিমাণে খেলে আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে। এর কারণগুলো হল—

• **সর্বোত্তম মস্তিষ্কের কার্যকারিতা :** ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিনের পুষ্টি মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য (যেমন স্মৃতি একাগ্রতা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

• **শারীরিক বৃদ্ধি ও উন্নয়ন :** বিশেষ করে, শিশু ও কিশোর–কিশোরীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য আবশ্যক। এটি প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং শরীরের বিকাশকে সহজতর করে।

• **ইমিউন ফাংশন বাড়ায় :** সঠিক পুষ্টি শরীরকে শক্তিশালী করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ।

• **শক্তির মাত্রা বাড়ায় :** কার্বোহাইড্রেট, চুরি এবং প্রোটিনের সঠিক ভারসাম্য সারাদিন ধরে শক্তির স্থির সরবরাহ প্রদান করে।

• **দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি হ্রাস করে :** সুষম খাদ্য স্বাস্থ্যকর ওজন ও পুষ্টি বজায় রাখার মাধ্যমে স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং উচ্চরক্তচাপের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়।

• **হজমের উন্নতি ঘটায় :** পর্যাপ্ত ফাইবার গ্রহণ, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও প্রচুর জল গ্রহণ মসৃণ হজম নিশ্চিত করে, স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করে।

• **হাড় মজবুত করে :** সুষম খাদ্যের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন–ডি এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদানগুলো হাড় শক্তিশালী করে এবং অস্টিওপোরোসিসের মতো হাড় সম্পর্কিত রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

• **স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখে :** খাবারের সুষম অংশ খাওয়া ক্যালরি নিয়ন্ত্রণকরতে সাহায্য করে, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখে।

তাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে আমরা সুর্যম খাদ্য নির্দিষ্ট নিয়মে পরিণমতো খাব এবং অল্প কিছু ব্যায়াম প্রতিদিন করব। ❑

একমাত্র স্বাস্থ্য–সচেতন পাঠক–পাঠিকাদের জন্যই লেখা

বিপদ থেকে বাঁচুন

দাম ১০০ টাকা

✪✪ সুস্বাস্থ্য প্রকাশনী ✪✪

ফুলের ওষুধি গুণ

ডঃ রমলা মুখার্জি

বাড়িতে বা উঠানে কতরকমেরইফুলগাছ থাকে। আমরা ফুলগুলি পুজোয়, গৃহসজ্জায় কিংবা উৎসবে ব্যবহার করি কিন্তু ফুলগুলির মধ্যে বা ফুল গাছগুলির মধ্যে যে কত ভেষজ গুণ আছে, তা অনেকেই জানি না।

আমি আজ চারটি উঠানে লাগানো ফুল গাছের ভেষজ উপকারিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। ভেষজ গাছের ব্যবহার বর্তমান সভ্যতার রাসায়নিক ওষুধের রমরমা প্রচারের যুগে লুপ্তপ্রায়, কিন্তু ভেষজ উপাদানগুলির যে কত গুনাগুণ তা বলে বোঝানো যাবে না, কারণ এগুলির কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তো নেই উপরন্তু একটি রোগ ভালো করতে গিয়ে আরো কয়েকটি রোগ তাঁর সঙ্গে ভালো করে দেয় এই উপাদানগুলি।

করবী

পরিচিতি

করবী একটি লাল গোলাপি বা সাদা ফুলবিশিষ্ট চিরহরিৎ গুল্ম। এর বৈজ্ঞানিক নাম নেরিয়াম ওলিয়েন্ডার বা নেরিয়াম ইন্ডিকাম। লাল রঙের করবী ফুলকে রক্তকরবী বলা হয়।

বাসস্থান

সুন্দর দেখতে ও অত্যন্ত রুক্ষ পরিবেশে বাড়তে পারে বলে বহু জায়গায় স্বজাবার জন্যএটি চাষ করা হয়।

করবীর প্রজাতিগুলি প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। তবে ভূমধ্যসাগরীয় ও এশীয় অঞ্চলে করবী বেশি দেখা যায়।

বর্ণনা

এরা ২–২.৫ মিটার উঁচু এবং চিরসবুজ গুল্ম জাতীয় গাছ। করবীর গোড়া থেকে অনেকগুলো ডাল বের হয় ঝোপের মতো। পাতা ডালের আগার দিকে বেশি। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় করবীর ফুল হয়।

উপকারিতা

▪ **ব্যবহৃত অংশ**

মূল, পাতা, তরুক্ষীর।

▫ **মূল**

●পেটে বায়ু উৎপন্ন হলে মূলের ছাল চূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম করে সকালে ও বিকালে একবার করে জলসহ খেলে বায়ুর প্রকোপ কমে।

●ঠান্ডা লেগে বা পেট গরমে বারবার হাঁচি হলে মূলের ছাল চূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম জলসহ খেলে সেরে যাবে।

●অম্বল রোগে মূলের ত্বক চূর্ণ ১২৫ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম সকালে বিকালে জলসহ খেলে খুব উপকার হয় ।

●অর্শের রক্ত পড়া বন্ধ করতে মূলের ছাল চূর্ণ ১০০ মিলিগ্রাম মাখনের সঙ্গে খেলে উপকার মেলে।

●অকালে চুল পাকা কমাতে করবীর মূলের ছাল বেটে মাথায় লাগানো খুব উপকারি।

●খোস–পাঁচড়া সারাতে এর মূল বেটে তিল বা নারকেল তেলের সাথে মিশিয়ে, ফুটিয়ে, ঠান্ডা করে মাখতে হবে ।

●ব্রণ কমাতে মূলের ছাল বেটে লাগালে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

▫ **পাতা**

●করবী গাছের পাতা বেটে নিয়ে অল্প গরম করে ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে ক্ষত দ্রুত শুকিয়ে যায়।

●গায়ে চুলকানি হলে, করবী গাছের পাতা সেদ্ধ করে স্নান করলে চুলকানি ভালো হয়ে যায়।

▫ **তরুক্ষীর**

করবীর তরুক্ষীর হরিতকীর গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে, শুকিয়ে, গুঁড়োটা দিয়ে দাঁত মাজলে পায়োরিয়া রোগের ক্ষেত্রে উপকার মেলে।

সতর্কতা

করবীর পাতা খুব বিষাক্ত, তাই এটি কখনোই খাওয়া চলবে না। বাহ্যিক প্রয়োগ করতে হবে। করবী পাতা খেয়ে গবাদি পশুর মৃত্যুর ঘটনাও শোনা যায়, তাই করবীর পাতা খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে।

অশোক

পরিচিতি

বোটানিকাল নাম সারাকা ইন্ডিকা।

বাসস্থান

অশোক গাছ ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমার সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়।

বর্ণনা

অশোক গাছ হল একটি মাঝারি আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ। পাতা ঘন, গাঢ় সবুজ রঙের। বসন্তকালে উজ্জ্বল কমলা থেকে লাল রঙের সুন্দর ফুল গুচ্ছাকারে ফোটে।

ব্যবহৃত অংশ

ছাল, পাতা, ফুল এবং বীজ।

▫ **ছাল**

●বাতের ব্যথায় প্রায়ই মাংসপেশি সংকুচিত হয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে ১২ গ্রাম অশোক ছাল চার কাপ জলে সিদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সকাল বিকাল দুচামচ করে খেলে উপকার হয়।

● মেয়েদের দীর্ঘদিন সাদা ও রক্ত স্রাবে বিকেলে দু চামচ করে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

●১০ গ্রাম অশোকছাল এক কাপ জলে ১০–১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর সেটা ছেঁকে খেলে অর্শের রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

●হার্টের সমস্যায় অনুরূপভাবে ছালের রস খেলে উপকার পাওয়া যায়।

●১৫ গ্রাম অশোক ছাল চার কাপ জলে সিদ্ধ করে একটু দুধ মিশিয়ে প্রত্যহ একবার করে মাসিক বন্ধ হবার পর থেকে খেলে বন্ধ্যাত্ব ঘোচে এবং বাচ্চা পেটে এলে নষ্ট হয় না।

●ডায়াবেটিস–বিরোধী এবং প্রদাহ–বিরোধী প্রভাবের প্রতিকারের জন্য ছালের নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

● হজমজনিত ব্যাধিতেও ছালের নির্যাস উপকারি।

● ছালের নির্যাস ব্যথানাশক এবং অ্যান্টিপাইরেটিক। এমনকি বিষাক্ত কীটের দংশনের যন্ত্রণাও কমায়।

ছাল আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এমনকি পাইলসের ক্ষেত্রে রক্ত পড়া বন্ধ করে দেয়।

▫ **পাতা**

●পাতার রস রক্তের শর্করার মাত্রা, কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এটি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে, ডায়বেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত উপকারি।

▫ **ফুল**

●ফুল মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় খুবই ভালো কাজ করে। নিয়মিত অশোক ফুল দিয়ে চা বানিয়ে খেতে পারলে গর্ভধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

●ফুলের নির্যাস হার্টের সমস্যা থেকে শরীরকে রক্ষা করে কারণ এটি খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যায়।

▫ **বীজ**

●ব্রণ, সোরিয়াসিস এবং ডার্মাটাইটিস সহ

ত্বকের বিভিন্ন চিকিৎসায় বীজচূর্ণ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়।

●আমাশা হলে রীজচূর্ণ হাফ গ্রাম গরম জলে গুলে দুবেলা খেলে সেরে যায়।

●বীজ বেটে কাঁচা হলুদের সাথে মাখলে খসখসে চামড়ায় লাবণ্য আসে।

●শ্বাসকষ্ট হলে এর বীজ পানের সঙ্গে চিবিয়ে খেলে শ্বাসকষ্ট কমে যায় ।

●বীজচূর্ণ খেলে অ্যালার্জির সমস্যা কমে যায়।

সতর্কতা

এই গাছের ফুল, পাতা ছাল সবকিছুই সঠিক মাত্রায় খেতে হবে। এগুলি স্বল্পমাত্রায় ওষুধের কাজ করে কিন্তু বেশি মাত্রায় বিষক্রিয়া করতে পারে।

নয়নতারা

পরিচিতি

নয়নতারা একটি ভেষজ উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম ক্যাথারান্থাস রোসিয়াস।

বাসস্থান

আদি নিবাস মাদাগাস্কার, তবে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফ্রিকা মহাদেশসহ আরও বেশ কয়েকটি দেশে এর দেখা পাওয়া যায়।

বর্ণনা

এটি একটি গুল্ম জাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ। তবে কখনো কখনো অনেক বছর বেঁচে থাকতেও দেখা যায়। দৈর্ঘ্য ২ফুটের বেশি নয়। পাতা বিপরীত, মসৃণ, আয়তাকার বা ডিম্বাকৃতি। পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল। গোলাপি, হালকা বেগুনী ও সাদা রঙের ফুল ফোটে। তবে গন্ধ নেই ফুলে। কাণ্ড কোনাচে ধরনের, রঙ বেগুনি বা সাদা, বারোমাসি উদ্ভিদ, বীজের সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি হয়।

ব্যবহৃত অংশ

পাতা, ফুল, সমগ্র অংশ, মূল ।

▫ **পাতা**

●নয়নতারা পাতা সেদ্ধ করে, তেলে পাক করে সেই তেল লাগালে খোসপাঁচড়ায় খুব উপকার হয়।

▫ **সমগ্র অংশ**

●কৃমিতে নয়নতারা গাছ সেদ্ধ করে জলটি ছেকে ৮–১০ দিন দু তিন চামচ,সকাল বিকাল খেলে কৃমি সেরে যায়।

● স্মরণশক্তি ভালো করতে এবং মেধার হ্রাসে ব্রেন টনিক হিসেবে নয়নতারার পাতা ও গাছের রস একমাস নিয়মিত খাওয়া দরকার।

● সমগ্র গাছের রসে প্রায় ৭০টি উপক্ষার (অ্যালকালয়েড) পাওয়া যায়। তার মধ্যে ভিনক্রিস্টিন ও ভিনব্লাস্টিন নামক উপক্ষার দুটি লিউকেমিয়া রোগের ওষুধ হিসেবে বিশেষভাবে গণ্য। তাই লিউকেমিয়া রোগে সমগ্র গাছের রস খুব উপকারি।

●গাছের রস ডায়াবেটিস রোগে খুব উপকারি কারণ এটি রক্তের চিনির পরিমাণ দ্রুত কমিয়ে দেয়। ৮–১০ দিন ব্যবহারের পর রক্ত পরীক্ষা করে পুনরায় ব্যবহার করা উচিত।

●গাছের সেদ্ধ জল হাই ব্লাড প্রেসার কমাতে সাহায্য করে। আট দশ দিন ব্যবহারের পর – রক্তচাপ মেপে দেখা উচিত।

▫ **ফুল**

●ফুল ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য একটি দুর্দান্ত ভেষজ। ডায়াবেটিস রোগীদের এই ফুলের নির্যাস প্রদান করলে তাদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। অ্যালকালয়েড, ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ট্যানিন হল কয়েকটি ফাইটোকেমিক্যাল, যা হাইপোগ্লাইসেমিক গুণাবলি প্রদান করে।

●নয়নতারা ফুল ক্ষারীয় উপাদানের কারণে ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি বিশাল ভূমিকা পালন করে। মূলত এর থেকে প্রাপ্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষারক, ভিনব্লাস্টিন এবং ভিনক্রিস্টিন, লিউকেমিয়া এবং লিম্ফোমা সহ ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য কেমোথেরাপি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ রিসার্চ ইন ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ভিনক্রিস্টিন কোষ বিভাজন রোধ করে ম্যালিগন্যান্ট কোষের বৃদ্ধি ধীর করে দেয়।

●নয়নতারা ফুল তার প্রদাহ–বিরোধী গুণাবলির জন্যও পরিচিত। নয়নতারার

উল্লেখযোগ্য ফাইটোকেমিক্যাল উপাদান, বিশেষ করে এর ফ্ল্যাভোনয়েড, যার শক্তিশালী প্রদাহ-বিরোধী প্রভাব রয়েছে। নয়নতারা ফুলে এমন রাসায়নিক রয়েছে, যা প্রো-ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন তৈরিতে বাধা দিতে পারে, যার ফলে প্রদাহ কমাতে পারে।

● শক্তিশালী অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণাবলির কারণে নয়নতারা ফুল অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়ক।

নয়নতারা ফুলের জৈব সক্রিয় রাসায়নিকগুলি ব্যাক্টেরিয়ার কোষ প্রাচীরের মসৃণ গঠন ভেঙে দেয় এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতাকে বাধা দেয়, যে কারণে এটি একটি অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল এজেন্ট।

● অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ধর্ম থাকার জন্য ফুলের নির্যাস বিভিন্ন রোগের উপর প্রভাব ফেলে, যেমন ভাইরাস, ছত্রাক এবং ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ।

▫ **মূল**

● পেটের যন্ত্রণায় মূলের ছাল বেটে চিনি মিশিয়ে সকালে বিকেল, দুবেলা খেলে উপকার হয়।

● উন্মাদ রোগে মূলের ছাল অনুরূপ পদ্ধতিতে খেলে উপকার হয়।

● মূলের রস দিয়ে কুলকুচি করলে শুষ্ক কাশি সেরে যায়।

● গলগন্ড রোগে মূল ৫ বা ৬ গ্রাম বেটে রস করে মধু মিশিয়ে সকাল ও বিকেল দু চামচ করে খেলে উপকার হয়।

সতর্কতা

নয়নতারা ফুলে অনেকগুলি উপক্ষার থাকার জন্য এটি খুবই সাবধানে এবং সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা খুবই দরকার। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এই গাছটি এবং ফুলগুলি ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

গাঁদা

পরিচিতি

গাঁদা বা গন্ধার বোটানিক্যাল নাম হল টাগেটিস ইরেকটা। এটি অ্যাস্টারেসি পরিবারের ট্যাজিটিজগণের একটি অল্প সুগন্ধী ফুল।

বাসস্থান

গাঁদা গাছের বাসস্থান হল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষ করে মেক্সিকো ও দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তরআমেরিকা থেকে শুরু করে ভারত, বাংলাদেশ,পাকিস্তান—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গাঁদা গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছ সহজেই বিভিন্ন মাটিতে এবং পরিবেশে জন্মাতে পারে।

বর্ণনা

গাঁদা একটি বর্ষজীবী বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। গাছগুলি ১ থেকে ৫ ফুট লম্বা হয়। সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রতিদিন ৫-৬ ঘন্টা সূর্যালোকের প্রয়োজন হয়।

গাঁদা ফুল বিভিন্ন জাত ও রঙের দেখা যায়। এই ফুল গোলাকার, উজ্বল হলুদ ও গাঢ় খয়েরী রংয়ের হয়ে থাকে। সাধারণত এটি শীতকালীন ফুল হলেও বর্তমানে এটি গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালেও হয়ে থাকে। বাগানের শোভা বর্ধন ও ভেষজ গুণ ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ও গৃহসজ্জায় এর ব্যাপক ব্যবহার চাহিদা আছে।

ব্যবহৃত অংশ

● পাতা, ফুলও, সমগ্র অংশ।

▫ **পাতা**

গাঁদা পাতার রস কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেট ফাঁপা ও গ্যাসের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে।

● গাঁদা পাতার রস ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন - ফোঁড়া, ব্রণ, চুলকানি, এবং অন্যান্য ঘা সারাতে সাহায্য করে ।

● রক্তার্শে ব্যবহৃত হয়।

● কানের ব্যথায় দু এক ফোঁটা রস কানে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

● চোখের রোগে খুব উপকার হয় ।

● কার্বাঙ্কলে পাতার প্রলেপ খুব উপকারি।

● ফোঁড়ার ওপরে পাতার প্রলেপ দিলে ফোঁড়া তাড়াতাড়ি ফেটে যায়।

● ইউরিন সমস্যা সমাধানে গাঁদা পাতার রস দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

● গাঁদা পাতা ক্ষত সারাতে এবং রক্তপাত বন্ধ করতে সাহায্য করে।

● গাঁদা পাতার নির্যাস গলা ব্যথা এবং মুখের আলসার নিরাময়ে সাহায্য করে।

● গাঁদা পাতা, অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল হিসাবে কাজ করে, যা শরীরের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

▫ **ফুল**

● গাঁদাফুলের মধ্যে চমৎকার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট-ধর্মী উপাদান থাকায় গাঁদা ফুলের রস দুবেলা এক চামচ করে সেবন করলে জরা ব্যাধি সহজে শরীরে আক্রমণ করতে পারে না ।

● কোনও পোকার কামড়, আঁচিল এবং ব্রণ উপশম করতে এই ফুলের রস ব্যবহার করা হয়।

● গাঁদা ফুলে ৮.৩৬ শতাংশ প্রাকৃতিক এসপিএফ অর্থাৎ সূর্যের রোদ থেকে ত্বককে রক্ষা করার ক্ষমতা আছে। এ ছাড়া রোদে পুড়ে ত্বকের যে কালচে ছোপ পড়ে, তা দূর করে ও ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে ফুলের নির্যাস ।

● এই ফুলের পাপড়ির রস এক চামচ করে একটু মাখন সঙ্গে মিশিয়ে দিনে দু'বার করে খেলে অর্শের যন্ত্রণা কমে, রক্ত পড়া বন্ধ হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

▫ **সমগ্র অংশ**

● বাতের বেদনায় সমগ্র অংশের রস খুবই উপকারি।

● পুরাতন সর্দিকাশিতে সমগ্র অংশের রস দুবেলা হাফ কাপ করে সেবন করতে পারলে খুব উপকার হয়।

● খালি পেটে দুই চামচ সমগ্র অংশের রস খেলে কৃমি ভালো হয় ।

● মূত্রাল্পতায় সমগ্র অংশের রস খুব কাজ দেয়।

সর্তকতা

গাঁদা গাছে উপক্ষার বেশি থাকায় এই গাছের পাতা, সমগ্র অংশ, ফুল সঠিক পরিমাণে খেতে হবে। চোখে এবং কানে পাতার রস ব্যবহার করার আগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে রোগ নিরাময়ের একমাত্র উপায় ছিল ভেষজ উদ্ভিদ। সেই ঐতিহ্যের হাত ধরে আমাদের তো ফিরে আসতেই হবে ভেষজে কারণ, প্রায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন এই সমস্ত ওষধি খুবই সুলভে অথবা প্রায় নিঃখরচার লভ্য। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে ভেষজের ব্যবহার তাই আশু প্রয়োজন। ❑

স্পোর্টস ইঞ্জুরি : আকুপাংচার চিকিৎসা

ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত
মোবাইল : ৯৮৮৩১২০৭৬

মাস খানেক আগে এক স্কুল শিক্ষকের আকুপাংচার চিকিৎসা করতে হচ্ছিল। উনি স্কুলে স্পোর্টস শেখান। নিজের বাড়িতেও জুডো ক্যারাটে শেখান। তা ওই শেখানোর সময়ই ওঁর ঘাড়ে আর কাঁধে একটা চোট লাগে। সেটারই চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসা চলাকালীন উনি একদিন জিজ্ঞেস করলেন 'আচ্ছা ডাক্তার বাবু, কোন কোন খেলার খেলোয়াড়রা স্পোর্টস ইঞ্জুরি নিয়ে আপনাদের কাছে আকুপাংচার করাতে আসে'?একটু চিন্তা করে বললাম— ফুটবল....সবচেয়ে বেশি আসে ফুটবল খেলোয়াড়রা। আর সবচেয়ে কম সম্ভবত ক্রিকেটের লোকেরা! যদিও ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার তাঁর কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আকুপাংচার চিকিৎসা নিয়েছেন। উনি নিতেন ওঁর টেনিস এলবোর জন্য। আসলে বিভিন্ন খেলার অনেক জনপ্রিয় খেলোয়াড়ই আকুপাংচার চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে প্রচারের অভাবে সেগুলো ততটা জনসমক্ষে আসেনি। এই যেমন টেনিস তারকা পিট সাম্প্রাসের কথাই ধরা যাক। ২০০১ সাল নাগাদ কোমরের ব্যথা ওঁর কেরিয়ারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময় আকুপাংচার করিয়েই উনি আবার খেলার জগতে, ফিরে আসেন। কিন্তু সে খবর ক' জনাই বা জানতে পেরেছিল? খবরের কাগজেও খুব বেশি সেটা হাইলাইট হয়নি! আবার উল্টোটাও ঘটেছে। ২০১৬ সালের অলিম্পিকের সময় বিখ্যাত সাঁতারু মাইকেল ফেল্পসের শরীরে কালচে লাল ছোপ ছোপ দাগ বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরে ফেল্পস

নিজেই জানান ওটা আসলে কাপিং থেরাপির দাগ। কাপিং হল আকুপাংচার-এর একটা সহযোগী চিকিৎসা। ওই ঘটনার পর কাপিং-এর ভীষণ রকম প্রচার হয়ে যায়।

আমাদের দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনের কত ফুটবলার যে আকুপাংচার চিকিৎসায় উপকৃত হয়েছেন, তা গুনে শেষ করা যাবে না। সেগুলোও খুব একটা প্রচার পায় না। এক জন উপকৃত হলে, অন্যকে বলেন এই যা। সারা বিশ্ব জুড়ে অজস্র খেলোয়াড় আকুপাংচার থেকে উপকৃত হচ্ছেন। কেউ কেউ সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। ফলে মানুষজন জানতে পারছেন। যেমন আমেরিকার জিমন্যাস্টিক খেলোয়াড় অ্যালেক্স নডোরও কাপিং-এর পরের ছবি আপলোড করে ছিলেন। জাপানের চিসাটো ফুকুসামা আবার আর এক কান্ড ঘটিয়েছিলেন। পেটের ওপর পেশিতে কিছু টেপের মতো বস্তু নিয়ে তিনি দৌড়েছিলেন। পরে তিনি জানান ওগুলো অতি সূক্ষ্ম আকুপাংচার সূঁচ। নির্দিষ্ট কিছু বিন্দুতে সূঁচ ফোটানো থাকায় ওর পেটের পেশির পুরনো ব্যথা নিয়েও উনি দৌড়তে সক্ষম হয়েছিলেন! ২০০৮-এর অলিম্পিকের আগে মাসল স্ট্রেইন- এর জন্য আকুপাংচার চিকিৎসা নিয়েছিলেন চিনের সাঁতারু ইন চিয়ান। ওই অলিম্পিকে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। আমেরিকার মহিলা দৌড়বিদ জিডি ট্রাটলার ২০১২ সালের অলিম্পিকের ৪০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। উনিও নিয়মিত আকুপাংচার চিকিৎসা নিয়েছেন। ওই সময়েই কানাডার মার্ক ম্যাকমরিস অলিম্পিক শুরুর সপ্তাহ দুয়েক আগে এক দুর্ঘটনায় চোট পান। ফলে আলিম্পিকে তার অংশ গ্রহণ করাই অনিশ্চিত হয়ে যায়। তখন তিনি নিয়মিত আকুপাংচার চিকিৎসা করিয়ে সেরে ওঠেন। এবং ওই অলিম্পিকে তিনিও ব্রোঞ্জ পদক জেতেন!

একটা আশ্চর্য ঘটনা মনে পড়ে গেল। ইউএসএ-এর হাই জাম্পার অ্যামি অ্যাকাফ নিজে আকুপাংচার চিকিৎসায় উপকৃত হয়ে আকুপাংচার চিকিৎসা শিখে নিয়েছিলেন। উনি লন্ডন অলিম্পিকে ইউএসএ টিমের আকুপাংচার চিকিৎসক হিসেবে গিয়েছিলেন। এবং বলাই বাহুল্য টিম সদস্যরা ওঁর দ্বারা খুবই উপকৃত হয়েছিলেন।

খেলোয়াড়দের যেটা সবচেয়ে বড় ভয় থাকে সেটা হল নিষিদ্ধ ওষুধ শরীরে চলে না যায়! আকুপাংচার ওষুধবিহীন চিকিৎসা হওয়ায় সেই ভয় থাকে না। অন্যদিকে পেশির চোট বা ব্যথা দ্রুত কমাতেও আকুপাংচারের জুড়ি নেই। ফলে বিশ্ব জুড়ে আকুপাংচার চিকিৎসার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। ❑

“চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবারে অর্থাৎ ২০২৫ সালে নোবেল পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী মেরি ব্রাঙ্কো ও ফ্রেড রামসডেল ও জাপানের বিজ্ঞানী শিমন সাকাগুচি। মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম কীভাবে কাজ করে? কোন জীবাণু মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক আর কোনটা নয়, তা এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে চিহ্নিত করতে পারে? এ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণেই বা থাকে কী করে? এসব নিয়েই গবেষণা করেন এই তিন বিজ্ঞানী।”

২০২৫ : চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল

ডঃ শৌর্যেন্দ্রনাথ সরকার

গত ২০ নভেম্বর ২০২৫-এ নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরটি কারও চোখ এড়িয়ে গিয়েছে বলে মনে হয় না। খবরটি ছিল ‘বিজ্ঞানে নোবেল জয়ীদের মজার কাহিনী’ নিয়ে প্রদর্শনী। হ্যাঁ, প্রতিবছর অক্টোবর মাসে বিজ্ঞানসহ নানা ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। আর এই ২০২৫ সালে পুরস্কার প্রাপকদের এরকম সব মজার কাহিনী নিয়েই শুরু হয় এক প্রদর্শনী। প্রদর্শনী চলে বালিগঞ্জের বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে অর্থাৎ বি.আই.টি.এম-এ। ফিজিওলজি, মেডিসিন, রসায়ন, ইকোনমিক সায়েন্স ও পদার্থ বিজ্ঞানে যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাদের নিয়েই এ প্রদর্শনী। প্রদর্শনস্থলে গাছের আদলে নোবেল জয়ীদের ছবিসহ তাদের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে—খবরে এমন কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুরস্কারের নাম বলতে সকলেই বোঝেন ‘নোবেল প্রাইজের’ কথা। সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল ১৮৯৫ সালে একটি উইল করে যান। আর সেই উইলের জন্যই তিনি আজও বিশ্ববিখ্যাত। মৃত্যুর পর দেখা যায় উইলে একটি ফাউন্ডেশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। নোবেল ফাউন্ডেশন। সেই ফাউন্ডেশনের কাজ হবে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা ও সাহিত্য ক্ষেত্রের সেরা ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করা। এই তালিকায় ১৯০৫ সালে যুক্ত হয় নোবেল শান্তি পুরস্কার। আর ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতির জন্য আলফ্রেডের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পুরস্কার দেয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ সুইডেন। নোবেলেরই সমমানের পুরস্কার এটি। বর্তমানে প্রত্যেক পুরস্কারের জন্য সনদ ও সোনার পদক বা মেডেল সহ এক কোটি দশ লক্ষ ক্রোনা বা নয় লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থ প্রদান হয়।

১৯০১ সালে যখন নোবেল পুরস্কার চালু করা হয়, তখন পদকটি তৈরি করা হত খাঁটি সোনা দিয়ে। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে পদক তৈরির ধরনে কিছুটা পরিবর্তন আসে, বর্তমানে নোবেল পদকটি মূলত ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরি এবং এর ওপর একটি পাতলা স্তরে ২৪ ক্যারেট খাঁটি

সোনার প্রলেপ থাকে। এ পদ্ধতিতে পদকটি দেখতে সম্পূর্ণ সোনার মতো মনে হলেও এটি মূলত সোনার একটি সংকর ধাতু। যার ওজন ১৭৫ গ্রাম।

ভারতে নোবেল বিজয়ীদের নাম বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এশিয়া থেকে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বে নজির গড়েন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই প্রথম অ-ইউরোপীয় ব্যক্তি যিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেন পান সি.ভি.রমন। ১৯৭৯সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন মাদার টেরিজা। ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পানপান আর এক বাঙালি অমর্ত্য সেন। ২০১৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান কৈলাস সত্যার্থী। এছাড়াও ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে ১৯৬৮ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পান হরগোবিন্দ খুরানা। ১৯৮৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয় করেন সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। ভেঙ্কটরমন রামাকৃষ্ণন ২০০৯ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। সর্বশেষ ২০১৯ সালে আর এক বাঙালি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান। এছাড়াও ভারতের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এমন নোবেল প্রাপকরা হলেন বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস, রুডিয়ার্ড কিপলিং, চতুর্দশ দলাই নামা ও ভি.এস.নাইপল।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবারে অর্থাৎ ২০২৫ সালে নোবেল পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী মেরি ব্রাঙ্কো ও ফ্রেড রামসডেল ও জাপানের বিজ্ঞানী শিমন সাকাগুচি।

মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম কীভাবে কাজ করে? কোন জীবাণু মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক আর কোনটা নয়, তা এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে চিহ্নিত করতে পারে? এ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণেই বা থাকে কী করে? এসব নিয়েই গবেষণা করেন এই তিন বিজ্ঞানী।

তাঁরা তাঁদের 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' সংক্রান্ত গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এক বিশেষ ধরনের 'রেগুলেটরি টি সেল'। অনেক সময় ইমিউন সিস্টেমকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ক্ষতিকারক জীবাণু নিজেদের বদলে মানুষের কোষের আকার ধারণ করে। সেক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থা যাতে মানুষের শরীরকেই আক্রমণ করতে না পারে, তার জন্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয় ওই টি-সেল। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা মানুষের শরীরের অঙ্গকেই আক্রমণ করত। নোবেল কমিটির তরফে ওলে ক্যাম্প জানিয়েছেন, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, কেন সব মানুষের অটোইমিউন রোগ হয় না—তা বোঝার জন্য এই তিন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

একসময় বিজ্ঞানীরা মনে করতেন আমাদের শরীরে যে সব ক্ষতিকারক প্রতিরোধী কোষ (ইমিউন সেল) থাকে, সেগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে যায় বলেই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কিন্তু ১৯৯৫ সালেই সাকাগুচি জানিয়েছিলেন যে, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেক বেশি জটিল। তার মধ্যে অবস্থিত কিছু বিশেষ কোষের জন্যই তা মানুষের শরীরকে আক্রমণ করতে পারে না। ২০০১ সালে ব্রাঙ্কো ও রামসডেলও 'অটোইমিউন' রোগ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। এভাবে এতদিনের দীর্ঘ গবেষণার জন্য স্বীকৃতি পেলেন তিনজন।

মানুষের শরীরের 'রোগ প্রতিরোধ' ব্যবস্থা, সত্যি কথা বলতে কি, যেন এক 'যুদ্ধক্ষেত্রে'। প্রতিদিন মানুষের শরীর অসংখ্য জীবাণুর আক্রমণের শিকার হয়। এই আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে শরীরের অতন্দ্র প্রহরী, রোগ প্রতিরোধতন্ত্র। সোজা ভাষায় বললে বলা যায়—দেহ তথা শরীরের নিরাপত্তাব্যবস্থা। সেখানে সেনাবাহিনীর মতো প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ শ্বেতরক্তকণিকা, টি-সেল, বি-সেল রক্ষা করতে অবিরাম ছুটে বেড়ায়। এই রোগজীবাণুগুলোর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন গড়ন রয়েছে, আবার অনেক জীবাণুর কোনো বিশেষ প্রতিরূপের সঙ্গে আমাদের মানব দেহকোষের অনেক মিলও রয়েছে। তাহলে কোন ক্ষেত্রে জীবাণুর ওপর আক্রমণ করতে হবে, কোন ক্ষেত্রে করতে হবে না, কীভাবে স্থির করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা? কী এমন বিষয় রয়েছে যার জন্য নিজ শরীরকেই আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা?

আক্রমণকারী জীবাণুর কোনো কোনোটি আবার আমাদের দেহকোষের রূপও নিতে পারে। অর্থাৎ ধারণ করতে পারে 'ছদ্মবেশ'। এদের সঠিকভাবে চিনে, নিজ শরীরের কোষকে আক্রমণ না করে রোগ প্রতিরোধ করে 'দেহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা'। প্রশ্ন হল, কীভাবে এত কিছু সম্ভব হচ্ছে? এই ধাঁধারই সমাধান করলেন তিন বিজ্ঞানী—শিমন সাকাগুচি, মেরি ব্রাঙ্কো এবং ফ্রেড র‍্যামসডেল।

এই ত্রয়ী জানতে পারেন এর নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের রোগ প্রতিরোধক কোষ। আর এই কোষগুলোকেই বলা হয় রেগুলেটরি টি সেল। একে বলা যায় 'শরীরের প্রহরী'। এসব কোষগুলোই নানা ভাইরাস বা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করে। এর পাশাপাশি শরীরে আরও এক ধরনের রোগ প্রতিরোধক কোষ রয়েছে—'রেগুলেটরি টি সেল'। এ কোষগুলোই মানুষের শরীরে 'অটোইমিউন' ব্যাধি বা রোগবালাই হওয়া আটকায়। আর এই যুগান্তকারি আবিষ্কারের জন্যই ম্যারি, ফ্রেড এবং শিমনকে ২০২৫ সালের চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করে সুইডেনের কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট।

নোবেল পুরস্কারের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে ইমিউন সিস্টেম কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় কোন অণুজীবকে আক্রমণ করতে হবে এবং কোনটিকে রক্ষা করতে হবে। আর এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিন বিজ্ঞানী শিমন সাকাগুচি, মেরি ব্রাঙ্কো ও ফ্রেড র‍্যামসডেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এই আবিষ্কার ইমিউন সিস্টেমের 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। যার মাধ্যমে শরীর ক্ষতিকর প্যাথোজেন এবং নিজস্ব কোষের মধ্যে পার্থক্য করে। এই যুগান্তকারী গবেষণার ফলে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ২০০-এর বেশি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলছে। এতে রেগুলেটরি টি-সেল ব্যবহার করে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জটিলতা এবং এমনকী ক্যানসার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে।

মানুষের শরীরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে কোনো দেশের সেনাবাহিনীর মতোই। সদা নির্ভীক, লড়াই করছে জীবাণুদের সঙ্গে। কিন্তু এরা আমাদের দেহকোষ এবং প্যাথোজেন বা জীবাণুদের মধ্যে পার্থক্য করে কীভাবে? প্রতিটি 'টি-কোষেই' 'টি-সেল রিসেপটর' বা টি-কোষগ্রাহক নামে বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকে। এরা একধরনের সেন্সরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই সেন্সরই জীবাণু সনাক্ত করার মূল কারিগর। 'টি-কোষ গ্রাহক' আবার নানা আকার-আকৃতির হতে পারে।

তাত্ত্বিকভাবে আমাদের দেহে বিপুল ধরনের বৈচিত্রময় টি-কোষ তৈরি হতে পারে। তাদের

থাকে আবার নানা আকারের গ্রাহক। এই আকার-আকৃতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসদের আকৃতি সনাক্ত করতে পারে। সমস্যা হল, শরীরে এমন কিছু গ্রাহক 'টি-কোষ' তৈরি হয়, যেগুলো শরীরের নিজস্ব টিস্যুর সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে। বারে বারে দেখা দেয় যে প্রশ্ন, তা হল এরা তাহলে কেন শুধু জীবাণুদেরই আক্রমণ করে? আসল কারণটা অবশ্য বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন ১৯৮০-র দশকে। আশির দশকের গোড়ায় জাপানের তরুণ ইমিউনোলজিস্ট শিমন সাকাগুচি একটি প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম কেন নিজের শরীরের সাধারণ কোষকে আক্রমণ করে না, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি একদিন ইঁদুরের থাইমাস গ্রন্থি অর্থাৎ যেখানে টি-সেল তৈরি হয় তা কেটে ফেলে দেন। ফলাফল ছিল ভয়াবহ। ইঁদুরগুলোর শরীরে অটোইমিউন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাদের ইমিউন সিস্টেম নিজ শরীরের সাধারণ কোষ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই শত্রু ভেবে আক্রমণ করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের শরীরে নানাধরনের জটিলতা দেখা দেয়। চামড়ার প্রদাহ, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শত্রু ভেবে আক্রমণ করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের শরীরে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। চামড়ার প্রদাহ, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্ষতি এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা। শেষপর্যন্ত এদের অনেকেরই মৃত্যু ঘটে। তবে পরবর্তী সময়ে আবার যখন সাকাগুচি এই ইঁদুরের শরীরে সুস্থ ইঁদুরের পরিপক্ক টি-সেল প্রবেশ করান, তখন রোগবালাই থেমে যায়। আর এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকেই তিনি ধারণা করেন যে ইমিউন সিস্টেমে অর্থাৎ প্রতিরোধী ব্যবস্থায় এমন কিছু কোষ আছে যারা অন্য কোষগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। আর এই শান্তিপ্রিয় 'সেনা' কোষগুলোকে খুঁজে পেতে সাকাগুচির লেগে যায় প্রায় দশ বছর।

বিশ্বচিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেন যে 'টি-কোষ' একধরনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। পরীক্ষাটি ঘটে 'থাইমাস' নামে নিরাপত্তা ব্যবস্থার এক বিশেষ অঙ্গের ভেতরে। এই অঙ্গের ভেতরেই রোগপ্রতিরোধক কোষগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করে। থাইমাস এসব টি-কোষকে শরীরের নিজস্ব প্রোটিনের কিছু অংশ দেখায়। যেসব টি-কোষ এসব প্রোটিনের অংশকে চিনতে পারে এবং সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলোকে ওখানেই ধ্বংস করে ফেলা হয়। আর যেগুলো আমাদের প্রোটিনকে চেনে না, তারা বেঁচে থাকে। তার মানে এগুলো ভবিষ্যতে ভুল করে আমাদের নিজস্ব টিস্যু বা অঙ্গকে আক্রমণ করবে না। শুধু জীবাণুদেরই আক্রমণ করবে। এটাই সেই সেন্ট্রাল ইমিউন টলারেন্স বা কেন্দ্রীয় সহনশীলতা।

বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন ঘটনা বোধহয় এইটুকুই। কিন্তু ১৯৯৫ সালে শিমন সাকাগুচির হাত ধরে প্রথম বোঝা গেল ঘটনা এত সহজ নয়। ১৯৯৫ সালে তিনি আবিষ্কার করেন এই কোষগুলোর অস্তিত্ব, নাম দেন 'রেগুলেটরি টি-সেল' বা নিয়ন্ত্রক টি-সেল। তিনি জানান এরা সিডি৪ এবং সিডি২৫ প্রোটিন দ্বারা চিহ্নিত হয়। রেগুলেটরি টি-সেল হল ইমিউন সিস্টেমের এক বিশেষ কোষ, যারা শরীরের রোগ প্রতিবোধ ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ইমিউন প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এদের কাজ হল ইমিউন সিস্টেমকে শান্ত রাখা, যাতে এটি শরীরের নিজস্ব কোষ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে আক্রমণ না করে। আর এরাই শরীরের 'সেনাবাহিনী' হিসেবে কাজ করে, যারা ইমিউন সিস্টেমের অন্যান্য কোষকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমেরিকার বায়োটেক কোম্পানি সেলটেক চিরোসায়েন্সে কাজ করছিলেন মেরি ব্রাঙ্কো ও ফ্রেড র‍্যামসডেল।

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়ল 'স্কারভি' নামক এক অসুস্থ ইঁদুর প্রজাতির ওপর। এই পুরুষ ইঁদুরগুলো জন্ম থেকেই ত্বকের সমস্যায় ভুগত। এদের প্লীহা ও লিম্ফ গ্রন্থিগুলো ফুলে যেত এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মারা যেত। ব্রাঙ্কো ও র‍্যামসডেল জানতে চাইছিলেন ঠিক কোন জিন এর জন্য দায়ী। তারা এক্স ক্রোমোজোমের বিশ্লেষণ শুরু করেন এবং অবশেষে কুড়িটি সম্ভাব্য জিনের মধ্যে একটি ত্রুটিপূর্ণ জিন খুঁজে পান, যার নাম দেন ফক্স পি৩। পরবর্তী সময়ে তারা আবিষ্কার করেন মানুষের শরীরে ফক্স পি ৩ জিনে ত্রুটি হলে আই পি ই-এক্স নামে এক ভয়াবহ অটোইমিউন রোগ হয় যা সাধারণত কঁচিকাঁচা তথা শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। ২০০১ সালে ব্রাঙ্কো ও র‍্যামসডেল নেচার জেনেটিক্স-এ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যেখানে প্রথম বলা হয় স্কারভি ইঁদুর ও আই পি ই-এক্স রোগের পেছনে রয়েছে ফক্স পি ৩ জিনের ত্রুটি। এরপর গবেষকরা সাকাগুচির রেগুলেটরি টি-সেল-এর সঙ্গে ফক্স পি ৩-এর সম্পর্ক খুঁজতে শুরু করেন। আর এর দু'বছরের মধ্যেই সাকাগুচি নিজেই প্রমাণ করেন ফক্স পি-৩ জিনই নিয়ন্ত্রণ করে রেগুলেটরি টি-সেল তৈরি হবে কিনা হবে না। অর্থাৎ ওই জিনই ঠিক করে শরীরের 'সেনা'কোষ তৈরি হবে কি না এবং শেষমেষ ইমিউন সিস্টেম কতটা নিয়ন্ত্রিত থাকবে। ❑

স্মৃতি বৃদ্ধির সাতকাহন

এক অননুকরণীয় লেখনিতে

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর কৌশল

লিখেছেন: ডাঃ মধুসূদন ভৌমিক

মূল্য ১০০টাকা

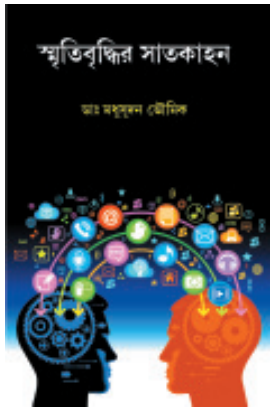

মওলিলং

এশিয়ার স্বচ্ছতম গ্রাম

সৌমেন্দ্র নাথ দাস

সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় এবং আসামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সাত দিনের সফরে সপরিবারে আমরা দেখেছিলাম মা কামাক্ষ্যা, বালাজি ও উমানন্দ মন্দির, উমিয়াম ও ওয়ার্ডস লেক, অ্যালিফ্যান্ট ও ঈগল জলপ্রপাত, মাওয়াজিমকুইন গুহা, প্রজাপতি মিউজিয়াম, ডাউকি নদী এবং কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য ও অর্কিড সংগ্রহশালা।

তবে এই ভ্রমণে আমার মন কেড়ে নিয়েছিল মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ছোট পাহাড়ি গ্রাম ''মওলিলং''। ২০০৩ সালে ট্রাভেলার ম্যাগাজিন ''ডিসকভার ইন্ডিয়া'' এটিকে এশিয়ার স্বচ্ছতম গ্রামের শিরোপা প্রদান করে। আর গ্রামটির এই অসামান্য খ্যাতি অর্জন স্থানীয় পর্যটন শিল্পকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে। তাই মওলিলং গ্রাম পরিদর্শনের জন্য পর্যটকদের উৎসাহ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এটি স্থানীয় মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে বহুলাংশে ত্বরান্বিত করেছে।

মওলিলং গ্রামটি মেঘালয়ের রাজধানী শিলং শহর থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে ভারত-বাংলাদেশের সীমানা লাগোয়া এলাকায় পাইনুরশালা ব্লকে অবস্থিত। এখানে কেবল খাসি সম্প্রদায়ের লোকদের বসবাস। চাষবাস এবং বাঁশভিত্তিক হস্তশিল্প হল স্থানীয় লোকেদের প্রধান পেশা। গ্রামটির মধ্যে প্রবেশ করলে এখানকার তৈরি হস্ত সামগ্রী এবং মোহময়ী ও অসাধারণ সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং স্থানীয় লোকদের উষ্ণ হার্দিক অভিবাদন আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বিশাল এলাকা জুড়ে মওলিলং গ্রামের বিস্তার। গ্রামের রাস্তাঘাট ঝকঝকে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন। চারপাশে কোথাও প্লাস্টিক ও কাগজের টুকরো বা অন্য কোনো আবর্জনা চোখে পড়ল না। বাশেঁর তৈরি ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার সুব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। এখানে ধূমপান এবং প্লাস্টিকের তৈরি সামগ্রী ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নেই বায়ু-দূষণজনিত কোনো পরিবেশ সমস্যা। নেই কোনো প্রকার কলকারখানা এবং যানবাহনজনিত শব্দ দূষণের মতো প্রকট সমস্যা।

সমগ্র গ্রামটি সুন্দরভাবে সাজানো। চারিদিকে লাগানো হয়েছে রকমারি ফুল, ফল ও সৌন্দর্য বর্ধক বৃক্ষরাজি যা কিনা চারিপাশে একটি অসাধারণ সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেছে। আর আছে গাছের উপরে থাকার জন্য বাঁশের তৈরি মাচাঘর। এখানে গাছের উপরে থাকার জন্য এই গাছঘরে উঠবার মজাই আলাদা। আর রয়েছে এখানে বাঁশের তৈরি সেতু। ছোট জলাশয়ের উপরে বাঁশের তৈরি সেতু দিয়ে আসা-যাওয়ার মজাই আলাদা। আর আছে রাস্তার ধারে সম্পূর্ণ তালপাতার তৈরি কুঁড়েঘর।

শিশুদের বিনোদনের জন্য রয়েছে দোলনা, রকমারি ফুলের বাগান, খেলাঘর এবং প্রজাপতি বাগান। রয়েছে অনেকগুলি ছোট মাপের দোকান ঘর যেখানে সাজানো রয়েছে অসাধারণ সুন্দর বাঁশের তৈরি নানান রকমের হস্তশিল্প সামগ্রী। এই গ্রামেই রয়েছে বেশ প্রাচীন গির্জা ঘর। গ্রামের খুব নিকটেই রয়েছে প্রকৃতির তৈরি বহু প্রাচীন, অসাধারণ সুন্দর জীবন্ত শিকড়সেতু। দুটি বিশাল, বড় মাপের রবার গাছের মাটির উপরিভাগে থাকা শিকড়গুলি পরস্পর জুড়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে এমন প্রাকৃতিক শিল্পকলা। এই শিকড় সেতুর উপর দিয়ে মানুষ খুব সহজেই চলাচল করতে পারে। আর এর ঠিক নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ি ঝর্ণার অবিরল শুভ্র জলরাশি যা করে তুলেছে সুন্দর ও মায়াবী। মওলিলং গ্রামের এই জীবন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাছ থেকে উপভোগ করতে গেলে এখানে আপনাকে একবার আসতেই হবে। এমন সুন্দর এই গ্রাম্য পরিবেশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থাও রয়েছে। চোখে পড়ল নাম না জানা পাহাড়ি পরাশ্রয়ী অর্কিডের রঙবাহারি সুদৃশ্য ফুল। অর্কিডের গাছগুলি অন্য গাছের উপরে পরগাছা হিসেবে জন্মেছে। আর রয়েছে মাংসাশী উদ্ভিদ কলসপত্রীর অসাধারণ সংগ্রহশালা যা আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

কীভাবে যাবেন : শিলং থেকে ট্যাক্সি অথবা ক্যাব বুক করে এখানে আসতে পারেন। এছাড়াও বাসে ডাউকি পর্যন্ত এসে বাকি পথ ট্রেকারে বা ট্যাক্সি করে এখানে পৌঁছাতে পারেন।

কোথায় থাকবেন : মওলিলং-এ থাকা ও খাবার জন্য বেশ কয়েকটি ঘরোয়া এবং গ্রাম্য হোমস্টে রয়েছে। ❑

সুস্বাস্থ্যের রান্না

ভারতী কুন্ডু
মোবাইল : ৮৪২০৭৯৪২৪৫

চিলি ফুলকপি

উপকরণ : ফুলকপি ১টি, পেঁয়াজ কুচনো ২টি, রসুন কুচনো ৮ কোয়া, ক্যাপসিকাম কুচনো ১টি, কাঁচালঙ্কা কুচনো ৬টি, টম্যাটো সস ২ চামচ, সয়াসস ২ চামচ, নুন প্রয়োজনমতো, চিনি স্বাদমতো, কর্নফ্লাওয়ার প্রয়োজন মতো, সাদা তেল ৫০ গ্রাম।

প্রণালী : ফুলকপি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ভাপিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম হলে পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে ভাজুন, অল্প রঙ আসলে কাঁচালঙ্কা ও ক্যাপসিকাম কুচি হালকা করে ভেজে ফুলকপি দিয়ে নুন, চিনি, সয়াসস ও টম্যাটো সস দিয়ে নাড়াচাড়া করে সামান্য জল দিন। নেড়েচেড়ে মাখামাখা হলে নামিয়ে ঢাকা দিন। রুটি, লুচি, পরোটার সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

টিপস ঃ ফুলকপিতে পোকা লাগে। তাই ফুলকপি কেটে দশ মিনিট নুন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পোকামাকড় বেরিয়ে যাবে।

এঁচোড় দই মশলা

উপকরণ : এঁচোড় ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ বাটা ২ চামচ, রসুন বাটা ১ চামচ, আদা বাটা ১ চামচ, জিরে বাটা ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ২ চামচ, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো ২ চামচ, হলুদ গুঁড়ো ২ চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ১ চামচ, কাজু বাটা ১ চামচ, কিসমিস বাটা ১ চামচ, টকদই ১ কাপ, ঘি ২ চামচ, টম্যাটো সস ১ চামচ, সাদা তেল প্রয়োজনমতো, নুন প্রয়োজনমতো, চিনি ১ চামচ, গোটা জিরে ও দুটো তেজপাতা ফোড়নের জন্য।

প্রণালী : এঁচোড় ডুমো ডুমো করে কেটে, জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন দিয়ে প্রেসারে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম হলে গোটা জিরে ও তেজপাতা দিয়ে গ্যাস কমিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে নাড়াচাড়া করে রসুন, আদা বাটা দিয়ে গ্যাস জোর করে লঙ্কাগুঁড়ো ও অল্প জল দিয়ে জিরে বাটা, লঙ্কাবাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে সেদ্ধ এঁচোড় দিন। নুন দিয়ে দিন। দই ফেটিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করে চিনি দিন। এরপর কাজুবাটা, কিসমিস বাটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে টম্যাটো সস দিয়ে অল্প গরম জল দিয়ে দিন। মাখা মাখা হলে ঘি ও গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে নেড়ে নিয়ে নামিয়ে ঢাকা দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

টিপস ঃ এঁচোড় কাটার আগে হাতে ভালো করে তেল মেখে নিন। কাটার পর ঘষে ধুয়ে নেবেন। হাতের দাগ সহজেই চলে যাবে।

কমলা লেবুর ফিরনি

উপকরণ : দুধ ১ লিটার, খোয়া ক্ষীর ১০০ গ্রাম, কমলালেবুর কোয়ার দানা ১ কাপ, কিসমিস ১৫ গ্রাম, চেরি কুচনো ৫০ গ্রাম, নেসলে মিল্কমেড হাফ কাপ, গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো ৫০০ গ্রাম, কেওড়া জল ১ চামচ, চিনি স্বাদমতো, ভাঙা কাজু ২৫ গ্রাম।

প্রণালী : আগে থাকতে ফোটানো ঠান্ডা দুধে চালের গুঁড়ো ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। গ্যাস কমিয়ে গ্যাসে বসিয়ে নাড়তে থাকুন। খোয়াক্ষীর, চিনি গুঁড়ো করে অল্প গরম জলে ভালোভাবে মিশিয়ে দুধে ঢেলে দিন। গ্যাস থেকে নামিয়ে একটু ঠান্ডা হলে কিসমিস, কাজু, চেরি ছড়িয়ে দিন। কেওড়া জল মিশিয়ে নেড়ে ঢাকা দিন। ফিরনি গ্যাস থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে কমলালেবুর দানা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। পরিবেশন করুন কমলালেবুর ফিরনি।

টিপস ঃ কমলালেবু কিছুক্ষণ গরম জলে রেখে তারপর রস বের করুন, রস অনেকটাই বেড়ে যাবে।

গুলেমাছ দিয়ে বেগুন

উপকরণ : গুলে মাছ ৫০০ গ্রাম, বেগুন ১টি লম্বা করে কাটা, টম্যাটো লম্বা করে কাটা ২টি, ধনেপাতা এক মুঠো, হলুদ গুঁড়ো ১ চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ৪টি, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো ১ চামচ, জিরে গুঁড়ো হাফ চামচ, ধনেগুঁড়ো হাফ চামচ, নুন স্বাদমতো, সরষের তেল ১০০ গ্রাম, কালো জিরে ১ চা–চামচ।

প্রণালী : মাছ ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন, হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। বেগুন নুন মাখিয়ে অল্প করে ভেজে নিন। এবার একই তেলে কালো জিরে ফোড়ন দিন। র টম্যাটো দিয়ে নাড়াচাড়া করে হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো সব মশলা অল্প জলে গুলে দিয়ে কষতে কষতে কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে নাড়তে নাড়তে অল্প জল দিন। ঝোল ফুটলে মাছ, আর বেগুন দিয়ে দিন। মাখা মাখা হলে ধনেপাতা কুচনো আর কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

ফ্রেঞ্চ অমলেট

উপকরণ : মুরগির ডিম ২টি, চিকেন কিমা ৫০০ গ্রাম, সেদ্ধ আলু ১টি, পেঁয়াজ কুচনো ১টি, কাঁচালঙ্কা কুচনো ২–৩টি, মাখন ৩ চামচ, লেবুর রস ১ চা–চামচ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী : ফ্রাইপ্যানে চিকেন কিমা ভাপিয়ে নিন। আলু পেস্ট করে কিমা, কাঁচালঙ্কা, অর্ধেক পেঁয়াজ কুচনো, লেবুর রস মিশিয়ে মেখে নিন। ফ্রাইপ্যানে অল্প মাখন দিয়ে সামান্য কষে নিন। ২টি ডিম ভেঙে বাকি পেঁয়াজ কুচি ও নুন মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। ফ্রাইপ্যানে বাকি মাখন গলিয়ে ফেটানো ডিমের মিশ্রণটি ছড়িয়ে দিন। গ্যাস মিডিয়ামে রাখবেন। এবার পুরটা ওমলেটের মাঝখানে লম্বা করে দিয়ে দিন। এবার খুন্তি দিয়ে ওমলেটটা মুড়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

রুইমাছের স্টু

উপকরণ : রুইমাছ সেদ্ধ ৩০০ গ্রাম, সিদ্ধ আলু কুচনো ২টি, সিদ্ধ কুচনো মটরশুঁটি ২০০গ্রাম, ১টি বড় টম্যাটো কুচনো, আদা কুচনো ১ চামচ, লেবুর রস আধখানা, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো হাফ চামচ, মাখন ৪ চামচ, নুন স্বাদমতো, কাঁচালঙ্কা চেরা ৪টি।

প্রণালী : কড়াইয়ে মাখন গলিয়ে মাছ ভেজে, সেদ্ধ সবজি দিন। টম্যাটো আর আদা কুচনো দিয়ে নাড়াচাড়া করে অল্প জল দিয়ে ফুটতে দিন। মরিচ গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে গরম মশলাগুঁড়ো দিন। লেবুর রস দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন।

কাটলেট

উপকরণ : মাংসের কিমা ৫০০গ্রাম, পেঁয়াজ কুচনো ৪টি, আদা বাটা ২ চামচ, রসুন বাটা ২ চামচ, লঙ্কাবাটা ২ চামচ, কাঁচালঙ্কা কুচনো ৩টি, জিরে গুঁড়ো ১ চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ১ চামচ, পাউরুটি ৫ স্লাইস, বিস্কুটের গুঁড়ো প্রয়োজন মতো। ডিম ফেটানো ৫টি, দুধ ২ কাপ, নুন ও সাদা তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালী : মাংসের কিমা ধুয়ে পরিষ্কার করে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ নরম করে ভেজে আদাবাটা, রসুন বাটা, লঙ্কা বাটা, নুন দিয়ে কষতে কষতে তেল ছাড়লে মাংসের কিমা দিন। নাড়তে নাড়তে শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে ঠান্ডা করে পেস্ট করে নিন। এবার মাংসের পেস্ট, লঙ্কা কুচনো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলাগুঁড়ো আর দুধে ভেজানো পাউরুটি মিশিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিন। হাতে করে পেস্ট করার সময় বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে নেবেন। এবার কাটলেটের আকারে গড়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ডিমের ব্যাটারে ডুবিয়ে আবার বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে কড়াইয়ে তেল গরম হলে দিয়ে দিন। দু'পিঠ ভালোভাবে ভেজে তুলে নিন। সস, স্যালাড দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

মটরশুঁটির কচুরি

উপকরণ : মটরশুঁটি ৫০০ গ্রাম, ময়দা ৫০০ গ্রাম, হিং চা–চামচের ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ২ চামচ, মৌরি গুঁড়ো ২ চামচ, গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চামচ, জিরে গুঁড়ো হাফ চামচ, চিনি ২ চামচ, নুন স্বাদমতো, সাদা তেল প্রয়োজন মতো, চিনি হাফ চামচ, বিটনুন হাফ চামচ, আদাবাটা হাফ চামচ।

প্রণালী : ময়দা, তেল নুন দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। মটরশুঁটি পেস্ট করে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম হলে হিং দিয়ে নাড়াচাড়া করে মটরশুঁটি পেস্ট দিয়ে মৌরি, জিরে, গোল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে কাঁচালঙ্কা বাটা, আদা বাটা, নুন, চিনি, বিটনুন দিয়ে পুর তৈরি করে নিন। এবার মাখা ময়দা থেকে লেচি কেটে নিন। এই লেচির মধ্যে পুর দিয়ে ভালো করে মুড়ে নেবেন। এবার লুচির মতো বেলে নেবেন। কড়াইয়ে তেল গরম করে ভালোভাবে দু'পিঠ ভেজে তুলে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

চিকেন ভাপা

উপকরণ : চিকেন ৫০০ গ্রাম, আদা বাটা দেড় চামচ, রসুন বাটা দেড় চামচ, জিরে গুঁড়ো হাফ চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চামচ, কাশ্মিরী লঙ্কা গুঁড়ো ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ২ চামচ, বড় একটি পেঁয়াজ কুচনো, টকদই ২ চামচ, মরিচগুঁড়ো হাফ চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো হাফ চামচ, সরষের তেল ৫০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, গোটা কাঁচালঙ্কা ৪টি।

প্রণালী : একটি টিফিন কৌটতে চিকেন, আদা, রসুন বাটা, জিরে, ধনে, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা বাটা, পেঁয়াজ কুচনো, টকদই, মরিচ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, সরষের তেল, নুন—সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে তার ওপরে গোটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে টিফিন কৌটোর ঢাকনা আটকে দিন। গ্যাসের ওপরে একটি কড়াইয়ে জল দিন, জল গরম হলে একটি স্টেনার বসিয়ে তার ওপর টিফিন কৌটো বসিয়ে ৪০ মিনিট পর নামান। টিফিন কৌটো ঠান্ডা হলে ঢাকনা খুলে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

শুঁটি আলুর দম

উপকরণ : গোটা ছোট আলু ১ কেজি, মটরশুঁটি ৫০০গ্রাম, টম্যাটো কুচনো ১টি, আদা বাটা ১ চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চামচ, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চামচ, সরষের তেল ৫০গ্রাম, নুন স্বাদমতো, চিনি ১ চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চামচ, ফোড়নের জন্য ২টি তেজপাতা, ১ চামচ গোটা জিরে, ২টি ছোট এলাচ, ২টি লবঙ্গ, ১টি ছোট দারচিনি।

প্রণালী : কড়াইয়ে তেল গরম হলে তেজপাতা, গোটা জিরে, গোটা গরম মশলা দিয়ে নাড়াচাড়া করে টম্যাটো দিয়ে নেড়ে নিয়ে আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে অল্প জলে মশলা কষতে থাকুন। তেল ছাড়লে মটরশুঁটি দিয়ে নাড়াচাড়া করে চিনি দিন। সেদ্ধ করে গোটা আলু তেল, নুন ও হলুদ দিয়ে অল্প করে ভেজে মশলা দিয়ে একটু কষিয়ে গরম জল দিন। স্বাদমতো নুন দিন। মাখা মাখা হলে কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে গরম মশলা গুঁড়ো ১ চামচ, ঘি ১ চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। গরম গরম লুচি, পরোটার সাথে পরিবেশন করুন। ❑

সংক্ষেপে

লেডিজ স্টাডি গ্রুপের ‘দ্য ওয়েট লস রেভেলিউশন’

সুদীপ্তা দাস : গত ১২ জানুয়ারি, ২০২৬–লেডিজ স্টাডি গ্রুপ (এলএসজি) লিড দ্য চেঞ্জ ব্যানারে ‘দ্য ওয়েট লস রেভেলিউশন’ শীর্ষক এক অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় সন্ধ্যার মাধ্যমে তাদের অনুপ্রেরণামূলক আলোচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে, যেখানে ডায়েট এবং দ্রুত সমাধান, বিপাক এবং দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতার উপর আলোকপাত করা হয়। অধিবেশনে পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত, দ্য ওয়েট লস রেভোলিউশন বইয়ের লেখক তথা ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এন্ডোক্রিনোলজিস্ট এবং ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডাঃ চন্দ্রশেখর মুখার্জির সাথে কথোপকথন করা হয়।

কেনিলওয়ার্থ হোটেলের লনে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে ওজন, স্বাস্থ্য, বিপাক এবং আধুনিক জীবনধারার মধ্যে জটিল সম্পর্ক নিয়ে একটি সূক্ষ্ম আলোচনার জন্য এলএসজি সদস্য এবং অতিথিদের একত্রিত করা হয়। সংলাপে প্রমাণ–ভিত্তিক বোঝাপড়া, টেকসই স্বাস্থ্য অনুশীলন এবং ক্ষণস্থায়ী প্রবণতার পছন্দের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়।

অধিবেশন চলাকালীন, ডাঃ অম্বরীশ মিত্তাল তুলে ধরেন যে জিএলপি–১ ওষুধের মাধ্যমে ওজন কমানোর বিপ্লব কীভাবে একটি ক্ষণস্থায়ী প্রবণতার পরিবর্তে একটি বড় চিকিৎসা সংক্রান্ত অগ্রগতি। তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে এই ওষুধগুলি ‘খাবারের শব্দ’ হ্রাস করে, ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর ফলে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ফলাফল উন্নত করে স্থূলতাকে একটি বিপাকীয় এবং মস্তিষ্ক–সম্পর্কিত অবস্থা হিসাবে মোকাবেলা করে। আলোচনায় মেনোপজ এবং মেনোপজ–পরবর্তী মহিলাদের উপর এর প্রভাব অনুসন্ধান করা হয়েছিল। ডাঃ চন্দ্র শেখর মুখার্জির সাথে আলোচনায় ওজন কমানোর বিষয়ে সাধারণ ভুল ধারণাগুলি তুলে ধরা হয়েছিল এবং দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য জীবনধারা পরিবর্তনের পাশাপাশি এই জাতীয় ওষুধের স্পষ্টতা এবং দায়িত্বশীল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

‘‘লেডিজ স্টাডি গ্রুপে, আমরা বিশ্বাস করি যে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন শুরু হয় তথ্যবহুল কথোপকথনের মাধ্যমে। এই অধিবেশনের মাধ্যমে, আমরা ট্রেন্ড এবং শিরোনামের বাইরে গিয়ে স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান এবং ওজন কমানোর সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বশীল বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে চেয়েছিলাম, বিশেষ করে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্রমণকারী মহিলাদের জন্য’’, বলেন লেডিজ স্টাডি গ্রুপের সভাপতি রিচা আগরওয়াল।

চিন্তা–উদ্দীপক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থপূর্ণ কথোপকথনের একটি সন্ধ্যা হল এই অনুষ্ঠানটি। যা লেডিস স্টাডি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনগুলিকে সহজতর করার দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনর্ব্যক্ত করে। এই অধিবেশনটি জীবনের প্রতিটি স্তরকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলিতে, তথ্যবহুল সংলাপকে উৎসাহিত করার জন্য এলএসজি–এর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। বিজ্ঞান এবং জীবিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কথোপকথনকে উৎসাহিত করে। যারা চিন্তাশীল সম্পৃক্ততাকে সমর্থন করে চলেছে। সন্ধ্যাটি একটি পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে শেষ হয়, যা অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রচলিত বর্ণনার বাইরে স্বাস্থ্যের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবহারিক বোঝাপড়া প্রদান করে।

উদ্যমী যুবক–যুবতীর খোঁজে বিজয়গড় বিবেকানন্দ যুব মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : যুবকরাও হার মানবে শ্রীরাম পালের মতো প্রবীণদের উদ্দীপনার কাছে। দক্ষিণ শহরতলীর বিজয়গড় ভারতমাতা ময়দানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ১৫দিন ব্যাপী বিবেকানন্দ যুব মেলা। মেলা কমিটির সদস্য–সদস্যারা বেশির ভাগই বয়স্ক। গত ১৩ বছর ধরে তারা যে উদ্দীপনার সঙ্গে এই বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছেন তা চাক্ষুস করলে অলস যুবক–যুবতীরাও লজ্জা পাবেন।

গত ২৯ ডিসেম্বর মেলার উদ্বোধন হয়েছিল

মহা সমারোহে। শেষ হল ১২ জানুয়ারি স্বামীজির ১৬৩তম জন্ম বার্ষিকীতে। মেলাতে বিভিন্ন আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে পালিত হল বিবেকানন্দ ভাব–প্রচার কর্মসূচি। কার্যকরী কমিটির সম্পাদক শ্রীরাম পাল জানা সহ সামগ্রিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বামীজির পৈত্রিক ভিটার মহারাজরা, প্রব্রাজিকা নিবেদিতাপ্রাণা মাতাজী, সাংবাদিক সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দেবীপ্রসাদ ব্যানার্জী এবং আরও অনেক গুণীজন। এই মেলার পৃষ্ঠপোষক কলকাতা পুরসভার একাধিক পুরপিতা এবং পুরমাতা।

অ্যাওর্টিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ মনোযোগের আহ্বান

সুদীপ্তা দাস : বিশ্বজুড়ে অ্যাওর্টাকে একটি স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে গত ২১ জানুয়ারি ২০২৬ নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতালে (মুকুন্দপুরে) জটিল ও অতি-জটিল অ্যাওর্টিক রোগে আক্রান্ত মানুষের কাছে বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়। এই রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে, ফলে অ্যাওর্টিক রোগের সময়মতো সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা নিয়ে জনসচেতনতা এবং চিকিৎসাগত গুরুত্ব বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে।

অ্যাওর্টা মানবদেহের বৃহত্তম ধমনী, যা শরীরের সব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। সাম্প্রতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে অ্যাওর্টাকে একটি পৃথক অঙ্গতন্ত্র হিসেবে পুনঃশ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এর রোগসমূহ অত্যন্ত জটিল এবং চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত সার্জিক্যাল দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম, ডিসেকশন এবং জটিল অ্যাওর্টিক আর্চ ও থোরাকো-অ্যাবডোমিনাল রোগের ক্ষেত্রে নির্ভুল রোগ নির্ণয়, উন্নত ইমেজিং এবং সমন্বিত মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি। দুঃখজনকভাবে, এই রোগগুলির উপসর্গ প্রায়ই হার্ট অ্যাটাকের মতো হওয়ায় বহু ক্ষেত্রে দেরিতে রোগ ধরা পড়ে।

গত কয়েক বছরে নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতাল পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন ওড়িশা, মিজোরাম, মণিপুর এবং দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে আগত বহু রোগীর চিকিৎসা করেছে। এমনকি ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশ থেকেও রোগীরা এখানে চিকিৎসার জন্য আসছেন। চিকিৎসকদের মতে, প্রায় ৩০ শতাংশ অ্যাওর্টিক রোগ প্রথমে ভুলভাবে হৃদরোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই হঠাৎ বুকে ব্যথা দেখা যায়। তবে হার্ট অ্যাটাকের তুলনায় তীব্র অ্যাওর্টিক সমস্যা অনেক দ্রুত মারাত্মক রূপ নিতে পারে এবং প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু-ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি থাকে, ফলে সময় এখানে জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য গড়ে দেয়।

নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট কার্ডিয়াক সার্জন ও অ্যাওর্টিক সার্জারি প্রোগ্রামের প্রধান ডাঃ অতনু সাহা বলেন,''অ্যাওর্টিক রোগ অনেক সময় নীরবে বা ভুলভাবে বোঝা হয়, যতক্ষণ না তা জরুরি অবস্থায় পরিণত হয়। হার্টঅ্যাটাকের সঙ্গে উপসর্গের মিল থাকায় রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব হয়। হার্ট অ্যাটাক আর অ্যাওর্টিক ডিজিজের সিম্পটম সম্পূর্ণ বুকে ব্যথা। বুকে ব্যথা হলে আমরা একটা গ্যাসের ওষুধ বা ব্যথার ওষুধ খেয়ে নিই। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। বুকে ব্যথাটা স্টমাক থেকেও হতে পারে, মাসলে চোট লেগে হতে পারে আবার হার্টের যে পাইপগুলো আছে যেগুলোকে করোনারি আর্টারি বলে, সেগুলো যখন ব্লক হয় সে কারণেও হতে পারে। আবার অ্যাওর্টিক ড্যামেজ হলেও হতে পারে। যখন কোনো পেশেন্ট বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা নিয়ে আসে তখন যারা ট্রিটমেন্ট করেন তাদের প্রধান কাজ হবে ঠিকঠাক ডায়াগনোসিস করা। কারণ হার্টের চিকিৎসা ও অ্যাওর্টিক চিকিৎসা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই ঠিকঠাক ডায়াগনোসিস অত্যন্ত জরুরি। এখানে টাইমটা অত্যন্ত জরুরি। অ্যাওর্টা যদি ফুলে যায় বা ফেটে যায় তাহলে বুকে অত্যন্ত জ্বালা, ব্যথা, মাথাঘোরা, শ্বাসকষ্ট হয়। ব্যথা বুকের মাঝখান থেকে শুরু করে এবং চিন্ চিন করতে করতে পুরো পায়ের নীচ অবধি চলে যায়। এই সময় সার্জারি অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে একজন অ্যাওর্টিক সার্জেন পারে এর চিকিৎসা করতে। আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় এই চিকিৎসা ব্যবস্থার ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে।''

তিনি আরও বলন, ''অ্যাওর্টিক রোগ সাধারণত বয়স্কদের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হলেও বর্তমানে ৩০-৪০ বছর বয়সী, বিশেষ করে লম্বা গড়নের মানুষের মধ্যে এই রোগ বাড়ছে। জন্মগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ অ্যাওর্টিক ভালভ, অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান এবং গর্ভাবস্থায় থাকা মহিলারা বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। এছাড়া একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে পেসমেকার থাকা রোগীরা অ্যাওর্টিক রোগে আক্রান্ত হন। এটা সম্পূর্ণ ভুল।''

ডাঃ শুভ্র এইচ. রায় চৌধুরী (ডিরেক্টর ও ক্লিনিক্যাল লিড, ইন্টারভেনশনাল ও এন্ডোভাসকুলার রেডিওলজি) বলেন,''জটিল অ্যাওর্টিক রোগের চিকিৎসার জন্য প্রকৃত অর্থে মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতির প্রয়োজন। আমাদের কেন্দ্রে কার্ডিয়াক সার্জন, ভাসকুলার বিশেষজ্ঞ, ইন্টারভেনশনাল টিম ও ইমেজিং বিশেষজ্ঞরা একসঙ্গে কাজ করেন, যাতে প্রতিটি রোগীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর চিকিৎসা পথ নির্ধারণ করা যায়। উন্নত সিটি ইমেজিং, ক্যাথেটারাইজেশন ল্যাব এবং ওপেন সার্জারির সুবিধার মাধ্যমে আমরা উচ্চ ঝুঁকির অ্যাওর্টিক রোগেও সঠিক রোগ নির্ণয় ও সময়োপযোগী চিকিৎসা দিতে সক্ষম হই। আমাদের ভাসকুলার ল্যাবে সহজলভ্য আউটপেশেন্ট আল্ট্রাসাউন্ড পরিষেবা রয়েছে এবং অ্যাওর্টিক ও অন্যান্য ভাসকুলার রোগের প্রাথমিক স্ক্রিনিংও করা হয়।''

ডাঃ ললিত কাপুর, সিনিয়র কনসালট্যান্ট কার্ডিয়াক সার্জারি বলেন,''অ্যাওর্টিক সার্জারি কার্ডিয়াক সার্জারির মধ্যেও একটি সুপার-সুপার-স্পেশালিটি ক্ষেত্র, যেখানে অতিরিক্ত দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত জরুরি। শুধু কার্ডিয়াক সার্জন নন, ভাসকুলার সার্জন ও ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্টদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই রোগীর সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত

করে। এই সংকটজনক সময়ে রোগীর পক্ষে এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ঘোরা সম্ভব নয়। তাই এমন একটি ডেস্টিনেশন সেন্টার প্রয়োজন যেখানে সব ধরনের সুবিধা এক জায়গায় পাওয়া যায় যা নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতালে উপলব্ধ। অ্যাওর্টিক টিমকে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, সঠিক সময়ে চিকিৎসা এবং সর্বোপরি টিমওয়ার্ক সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হয়।''

নারায়ণা আরএন টেগোর হাসপাতাল এই অঞ্চলে প্রথম নিয়মিতভাবে উন্নত অ্যাওর্টিক সার্জারি যেমন ফ্রোজেন এলিফ্যান্ট ট্রাঙ্ক, জটিল ফেনেস্ট্রেশন ও চিমনি পদ্ধতি চালু করে। বর্তমানে সর্বাধিক জটিল অ্যাওর্টিক কেস এখানেই চিকিৎসা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অ্যাওর্টা জড়িত থাকে বা জরুরি অবস্থায় রোগী আসেন, যার জন্য বিশেষ পরিকাঠামো, দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অপরিহার্য। প্রতিবছর এই ধরনের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, যা অ্যাওর্টিক রোগের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

মি. অভিজিৎ সি.পি. (ডিরেক্টর ও ক্লাস্টার হেড কলকাতা ও কর্পোরেট গ্রোথ ইনিশিয়েটিভ, নারায়ণা হেলথ(ইস্ট)) বলেন,''অ্যাওর্টিক রোগের অগ্রসর অবস্থায় রোগীর সংখ্যা বাড়া আমাদের আরও বেশি সচেতনতা, সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং সঠিক রেফারালের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেয়। অ্যাওর্টিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে এই প্রাণঘাতী রোগগুলির থেকে নিরাময়ের ফলাফল অনেক উন্নত করা সম্ভব।

এ বিষয়ে মি. আর. ভেঙ্কটেশ (গ্রুপ সিওও, নারায়ণা হেলথ) বলেন,''অ্যাওর্টিক রোগ অত্যন্ত মারাত্মক হলেও এখনও তা যথাযথভাবে চিহ্নিত হয় না। চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা জরুরি যে, সব বুকের ব্যথা হৃদরোগ জনিত নয়। প্রাথমিক ইমেজিং ও সঠিক রোগ নির্ণয় রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।''

চিকিৎসকদের মতে, হঠাৎ বুকে বা পিঠে ব্যথা, পেটের ব্যথা, অকারণ শ্বাসকষ্ট এবং অনিয়ন্ত্রিত উচ্চরক্তচাপের মতো লক্ষণগুলোকে কখনও অবহেলা করা উচিত নয়। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ইমেজিং-ভিত্তিক মূল্যায়ন করলে সময়মতো চিকিৎসার মাধ্যমে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যায়।

৭৬০ গ্রাম ওজনের নবজাতকের জীবন বাঁচাল চুনাভাটির নারায়ণা হাসপাতাল

সুদীপ্তা দাস : নবজাত শিশুর যত্নে বাংলা অনেকটা এগিয়েছে তার উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে চুনাভাটির নারায়ণা হাসপাতালের এক সদ্যোজাতের ঘটনা। ডাক্তাররা মাত্র ২৭ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় জন্ম নেওয়া ৭৬০ গ্রাম ওজনের এই অকাল শিশু কন্যার জীবন সফলভাবে বাঁচিয়েছেন।

চুনাভাটির নারায়ণা হাসপাতালে প্রসবের সময় নবজাতকটির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক ছিল। কারণ তার তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, যার জন্য যান্ত্রিক বায়ুচলাচলের প্রয়োজন হয়। এত কম ওজনের নবজাতককে সুস্থ রাখা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ডাঃ অখিলেশ্বর নারায়ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ দল গড়ে নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (এনআইসিইউ) সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

চিকিৎসা চলাকালীন, শিশুটির পেট ফুলে ওঠে এবং সবুজ বমি হয়, যা একটি গুরুতর অভ্যন্তরীণ সমস্যার সতর্কতামূলক লক্ষণ। এছাড়াও অন্ত্রে একটি বাধা দেখা দেয়, যা অকাল জন্ম নেওয়া শিশুদের বিশেষ করে যাদের ওজন ১ কেজির কম, তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি জীবন-হুমকিস্বরূপ অবস্থা। শিশুটির অবস্থা এবং অস্ত্রোপচারের জরুরি প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাবা-মায়েদের বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া হয়। চুনাভাটির নারায়ণা হাসপাতালে দ্রুত একটি বহুমুখী অস্ত্রোপচার দল গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন শিশু নবজাতক সার্জারির পরামর্শদাতা ডাঃ গৌতম চক্রবর্তী, সহায়তায় ছিলেন ডাঃ রশ্মি শাহী (সিনিয়র কনসালটেন্ট - অ্যানেস্থেসিওলজি) এবং ডাঃ রুচি (কনসালটেন্ট - অ্যানেস্থেসিয়া)। এই অস্ত্রোপচার ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ ৭৬০ গ্রাম ওজনের একটি ক্ষুদ্র এবং ভঙ্গুর নবজাতকের উপর অস্ত্রোপচারের জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি এবং যত্নের প্রয়োজন ছিল।

সফল অস্ত্রোপচার সত্ত্বেও, শিশুটি সেপসিস, শ্বাসকষ্ট, প্রোটিনের মাত্রা কমে যাওয়া এবং চোখের সাথে সম্পর্কিত জটিলতার মতো সমস্যাগুলির সাথে লড়াই করে। এই জটিল পর্যায়ে নবজাতক দলটি সতর্ক ছিল। চক্ষুবিদ্যার পরামর্শদাতা ডাঃ প্রেমাঞ্জন ভট্টাচার্য, দৃষ্টি-সম্পর্কিত যেকোনো ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য সময়মতো একটি বিশেষ চোখের ইনজেকশন দিয়ে হস্তক্ষেপ করেন।

ডাঃ অখিলেশ্বর নারায়ণ চৌধুরী বলেন, ''এত কম ওজনের শিশুদের অত্যন্ত নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং সময়োপযোগী চিকিৎসার প্রয়োজন। প্রতিটি ছোটখাটো উন্নতি গুরুত্বপূর্ণ। এই শিশুর পুনরুদ্ধার কেবল লড়াইয়ের মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে না বরং হাওড়ায় উপলব্ধ সমন্বিত নবজাতক যত্নের শক্তিকেও প্রতিফলিত করে।''

হাসপাতালে প্রায় দুই মাস নিবিড় পরিচর্যা এবং অবিরাম পর্যবেক্ষণের পর সময়ের সাথে সাথে শিশুটি ধীরে ধীরে উন্নতি করতে থাকে, শক্তি অর্জন করে এবং স্থিতিশীল অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

একইরকম মতামতের প্রতিধ্বনি করে ডাঃ গৌতম চক্রবর্তী বলেন, ''৭ ৬০ গ্রাম ওজনের নবজাতকের অস্ত্রোপচার করা নবজাতক অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি। আমাদের হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগগুলিতে সতর্ক পরিকল্পনা, বিশেষায়িত সরঞ্জাম এবং নিরবচ্ছিন্ন দলবদ্ধতার কারণে এই ক্ষেত্রে সাফল্য সম্ভব হয়েছে।

হাওড়া ও চুনাভাটির নারায়ণা হাসপাতাল, ফ্যাসিলিটি ডিরেক্টর, শ্রী তপানী ঘোষ বলেন, ''এই কেসটি সত্যি প্রমাণ করে যে, আমাদের চুনাভাটির নারায়ণা হাসপাতালের নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট কী ধরনের যত্ন প্রদানের জন্য প্রস্তুত।''

‘ঘাটাল উৎসব ও শিশুমেলা’

অরুনাভ বেরা, ঘাটাল : শিশুদের এমন কিছু মনের কথা,যা তারা কাউকে বলতে পারে না। মনের জমানো কথা লিখে তারা সেই মনের কথা বাক্সে জমা দিচ্ছে। তাদের অভিযোগ তথা মনের কথা অনুভব করে সেগুলি নিয়ে শিশুদের সাথে কথা বলছেন বড়রা।এমনটাই দেখা গেল ঘাটাল উৎসব ও শিশু মেলার একটি স্টলে। পৃথিবীর খবর হাতের মুঠোয়, আধুনিকতার ছোঁয়া সর্বত্র হলেও এখনো বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার এবং শিশু নির্যাতন হয়।

ঘাটাল মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে, শক্তি বাহিনী এবং কোসি লোক মঞ্চর সহযোগিতায় বাল্যবিবাহ রোধ, শিশু পাচার এবং শিশু যৌন নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সচেতনতামূলক স্টলের উদ্যোগ সাড়া সাগালো ঘাটাল উৎসব ও শিশু মেলাতে। মেলায় আসা মানুষজনকে এই বিষয়ে সচেতন করছেন উদ্যোক্তারা। শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর মল্লিকা পাল বলেন, মেলায় আসা মানুষজনকে আমরা এই বিষয়ে

এম.আর.ফিজিও’র সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি এম.আর.ফিজিও অ্যান্ড রিহ্যাব ইউনিটের উদ্যোগে জেরেন্টোলজি, জেরিয়াট্রিক সাইকোথেরাপি বিষয়ে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ফিজিও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এবং এই বিষয়ের ওপর নিজেদের চিন্তাভাবনার মডেল প্রকাশ করেন। এবং বক্তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে আয়োজিত কুইজ ও প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেরিয়াট্রিক সাইকোথেরাপিস্ট ডঃ কল্যাণ দে ও বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট তথা যোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ কল্লোল হালদার। অত্যন্ত কার্যকরি এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তারা স্লাইড সহযোগে বয়স্ক মানুষদের সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এই বিষয়গুলোর বিষয়ে প্রশ্নোত্তোরের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ফিডব্যাক নেন। শেষ পর্বে ওয়ার্ল্ড মেডিটেশন ডে উপলক্ষ্যে ডঃ কল্লোল হালদারের নেতৃত্বে মেডিটেশন ক্লাশ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি এম.আর. ফিজিওর কর্ণধার মৃণাল কুন্ডুর তত্ত্বাবধানে সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।

যৌনতা
যৌনসমস্যা ও
প্রতিকার নিয়ে

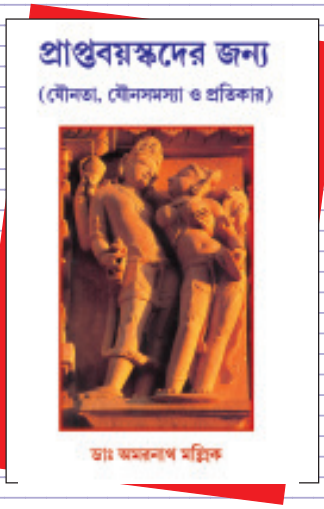

ডাঃ অমরনাথ
মল্লিকের
এক ব্যতিক্রমী বই

১০০ টাকা

সুস্বাস্থ্য প্রকাশনী

মা নসিক

ভাঙছে সমাজ বাড়ছে সমস্যা। ঘরে-বাইরে বাড়ছে মানসিক টানাপোড়েন। ফলে সমস্যাও বেড়ে চলেছে হু-হু করে। ব্যাপকভাবে বেড়ে-চলা মানসিক সমস্যা নিয়ে এই বিভাগে পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হাজির শহরের বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ।

প্রশ্ন

লজিক (**Logic**) বিষয়টা সবাই বুঝতে চায় না কেন? আমার তো মনে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ের পিছনে একটা লজিক আছে। এখন আমার যেটা জানার বিষয় সেটা হলো কেউ যদি একটা বিষয় নিজে থেকে বুঝে তাহলে সেটা লজিক দ্বারা ভুল প্রমাণিত করলে সে সেটা মানতে চায় না কেন? সে নিজে যেটা ঠিক মনে করে সেটা পৃথিবীর যতই লজিক দেখানো হোক না কেন সে সেটা মানতে নারাজ। এখানে সাইকোলজিকাল ব্যাপারটা কী? সাইকোলজি এখানে কিভাবে কাজ করে ?

শাহীন
ঢাকা, বাংলাদেশ

উত্তর

প্রশ্নটা বেশ চমকপ্রদ। একটা যুক্তি কখন আর একটা যুক্তির কাছে হেরে যায়। ফ্রয়েডের ভাষায় মানুষই একমাত্র প্রাণি যে যুক্তিহীন, আবার কার্ল রজার্সের ভাষায় মানুষই একমাত্র যুক্তিবাদী প্রাণি। অর্থাৎ মানুষের চরিত্রের এই পরস্পর বিরোধী দিকটা থেকে দুজন বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ঘোমটা সরিয়েছেন অনেকদিন আগে। আমরা শুধু বুঝে উঠতে পারিনি। মানুষ যুক্তির কাছেই সবচেয়ে বেশি নতজানু হয়। তার চেয়েও সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যুক্তি,মানুষের কাছে নতজানু হয়। বাস্তবে যুক্তি আর বিশ্বাসের মধ্যে পাতাল আর মহাকাশের মতোই সহস্রযোজন দূরত্ব। মানুষ যুক্তির ক্ষেত্রে ততটুকুই মেনে নেয় যেটা তার বিশ্বাসকে স্পর্শ করে না।

আমাদের মনে হয় সে নিজে থেকে যুক্তির বিশ্লেষণটা মেনে নিচ্ছে। মানুষ সেইটুকুই মেনে নেয় যেটা তার নিজের বিশ্বাসটাকে পাশ কাটিয়ে যায়। সমস্যা হয় অন্যেরা যখন তাকে সেই যুক্তির বিশ্লেষণটা তুলে ধরে সেটা সে মানতে চায় না কারণ সে তার নিজস্ব বিশ্বাসটাকে সত্য বলে মনে করে। মানুষের মনে গেঁথে থাকা বিশ্বাস ওপড়ানো যায় না। ফলে মানুষের যুক্তির দৌড় ওই বিশ্বাসের দোরগোড়া পর্যন্ত। একটা উদাহরণ

পার্থ প্রতিম রায়
(মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলর)
মোবাইল : ৮৬১৭৭৯২৪৫৯
ই-মেল : parthapratimroy08@gmail.com

দেওয়া যায় যে-বিজ্ঞানী গবেষণাগারে প্রতিটা বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে করতে এগোয়, কোনো প্রমাণ ছাড়া ফলাফলকে একদম বিশ্বাস করে না, সেই বিজ্ঞানীকে যদি প্রশ্ন করা হয় কোন যুক্তিতে আপনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন? আপনার কাছে তার অস্তিত্বের কোনো হাতে গরম প্রমাণ আছে? এই ব্যাপারে তার কাছে থেকে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য পাওয়া যাবে না। সে মানতেও চাইবে না ঈশ্বরের ভাবনাটা একটা ধারণা মাত্র।

যারা জ্যোতিষে বিশেষত পাথরের ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে কোনো যুক্তিতে বোঝানো যাবে না যে রেল লাইনের পাথর আর হীরে, রুবি বা নীলকান্ত মনির মধ্যে কোনো ফারাক নেই। কারণ পাথরের সাথে কয়লা মিশে হীরে তৈরি হয়। আর অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড মিশে রুবি বা নীলকান্ত মনি হয়। যেটা রেললাইনের পাথরের ক্ষেত্রে ঘটে না। পাথর হীরেই হোক বা রুবিই হোক তা আদতে পাথরই, বাস্তবে যার কোনো অদৃশ্য ক্ষমতাই নেই। জ্যোতিষ বিশ্বাসীদের কাছে পাথরের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এমনতর যুক্তি তো পদানতই হবে। যুক্তির দৌড় ততটুকুই, মানুষ যতটুকু মেনে নিতে রাজি। প্রবাদেই তো আছে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে লবডঙ্কা ।

এছাড়া মানুষের চরিত্রের মধ্যে এগ্রিয়েবিলিটি বলে কথা আছে,যাদের মধ্যে এর পরিমাণ বেশি তারা সহজে নতুন কোনো যুক্তির নতুন বিষয়টাকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। যাদের চরিত্রে এর পরিমাণ কম তারা যুক্তিকে মেনে নেওয়ার নমনীয়তা দেখাতে পারে না।

প্রশ্ন

অনেকের গর্ভকালীন অবস্থায় মাটির হাড়ি, কয়লা এসব খেতে ইচ্ছে করে। আবার অনেকেই বাচ্চা পেটে না থাকলেও 'মাটির হাড়ি খায়', এসব কেন খেতে ইচ্ছে করে কেউ কি বলতে পারবেন?

তন্ময়া
চন্দ্রকোনা, পশ্চিম মেদিনীপুর

উত্তর

চিঠিটা খুবই ছোটো তবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । আজও গ্রাম বাংলায় যেখানে কাঠের জ্বালে রান্না হয়, সে অঞ্চলের মহিলারা গর্ভকালীন অবস্থায় মাটির হাড়ি ,কাঠের উনুনের ভিতরের পোড়া অংশ বা কাঠ কয়লা খাবার মতো ঘটনা ঘটায় । এটা গ্রাম বাংলায় বহুল প্রচলিত বিষয়। এটা আলাদা একটা অসুখের বিষয়। আবার কেউ কেউ শুধুশুধুই মাটি বা মাটির হাড়ি ইত্যাদি খায়। তবে দুটো বিষয় কখনোই একটা গোত্রে ফেলা যাবে না। বলা যেতে পারে দু'লাইনের দুটো বিষয় সম্পূর্ণভাবে আলাদা আলাদা দুটো অসুখের বিষয়। দুটোই অভক্ষ্য খাদ্য (বা বস্তু) খাওয়ার প্রবণতা, যেটাকে একধরনের অসুখ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যার পোশাকি নাম পাইকা। পাইকা তিন ধরনের হয়। যার একটা ধরন হলো জিওফেজিয়া বা বলা যেতে পারে মাটি খোর বা যারা মাটি খায়। এরা পোড়া মাটি বা পোড়া মাটির ভাঁড় বা হাড়িভাঙা খেতে চায়। সাধারণত গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভধারণের মাঝামাঝি সময়ে একধরনের ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগের প্রবণতা দেখা দেয়। এটা দেখা দেয় মূলত প্লাসেন্টার বিশেষ রাসায়নিক ক্ষরণের ফলে রক্তে চিনির প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে। তারপরেই যত উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটতে থাকে বিশেষত গর্ভধারণের মধ্য পর্বেই মাটি, পোড়া

মাটি, হাঁড়ি, ভাঁড় খাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়। এছাড়াও বাচ্চা ধারণের কারণে শরীরে কিছু না কিছু পুষ্টি বা ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়। রক্তে আয়রনের খামতি থেকেও মাটি, পোড়া মাটি ইত্যাদি খাওয়ার তীব্রতা বাড়ে। অভক্ষ্য গেলো প্রথম পর্বের অসুখটার কারণের অনুসন্ধান। গর্ভবতী না হলেও অনেকে হাবিজাবি অভক্ষ খাদ্যবস্তু খায়। সেটাকে নির্ভেজাল পাইকা অসুখের মধ্যে ফেলা যেতে পারে। এরা ইট, কাঠ, পাথর, বরফ, মলমূত্রও খেয়ে ফেলে। এর পেছনেও রক্তে আয়রন, জিঙ্ক বা নানা পুষ্টির অভাব থেকে এই ধরনের অখাদ্য খাওয়ার তাড়না কাজ করতে থাকে। এর সাথে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত রোগের প্রভাবও অসুখটাকে বেশ জটিল করে তোলে। চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন পড়ে। রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে। তাতে শরীরে কোনো ভিটামিন বা খনিজের অভাব ঘটেছে কি না জানা যায়। চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের এবং মনস্তাত্ত্বিকের উভয়ের প্রয়োজন হতে পারে।

প্রশ্ন

আমি একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। আমার সমস্যা হলো আমি প্রচুর ওভার থিংক করি । কোনো কারণ ছাড়াই দুশ্চিন্তা হয় আর অনেক ভয় হয়। অনেক ছোট ছোট জিনিস নিয়ে প্রচুর চিন্তা আর ভয় করি। আমি জানি সেগুলো তেমন বড় সমস্যা নয় তাও মাথার মধ্যে সেগুলো নিয়ে নেগেটিভ চিন্তা হয়। সব সময় নেগেটিভ চিন্তা করি। আর ভয় পাই। এর থেকে বাঁচবো কীভাবে?

ইন্দ্রানী

অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা

উত্তর

মাত্রাহীন চিন্তা হলো মনের মায়া-গল্পের ফাঁদ। মাত্রাহীন চিন্তা হলো লাগামহীন চিন্তা। এটাকে ঠিক মনের অসুখের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবে মনের অন্যান্য অসুখের সাথী উপসর্গ হিসাবে মাত্রাহীন চিন্তা জ্বালাতন করতে থাকে। তবে লাগামহীন চিন্তার হাত ধরেই বিষণ্ণতা, উদ্বেগ বা শুচিবায়ুগ্রস্ত ইত্যাদির মতো অসুখেরা আনাগোনা শুরু করে। যে চিন্তার কোনো সীমানা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন বিশ্লেষণ প্রবাহে ঢুকে পড়ে। অকারণেই মনের মধ্যে নানান চিন্তাভাবনার আঁকিবুকি কাটতে থাকে, চুলচেরা পোষ্টমর্টেম করতে থাকে। এবং এই চিন্তা ভাবনার কোনো অংশই ইতিবাচক হয় না। আর মজার হলো এই চিন্তা ভাবনার মূল বিষয় হলো অন্ধকার মাখানো বেশ কয়েকটা সংযোগ-সূচক বা সংযোগ-অব্যয় শব্দ যেমন এবং, কিন্তু , যদি, তবে। এগুলো নানা হাবিজাবি ভাবনার গায়ে জোঁকের মতো লেপ্টে যায়। ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়ে দুশ্চিন্তাকে দীর্ঘায়িত করে, যদি এটা হয় .. যদি ওটা হয় ..সবই ঠিক আছে কিন্তু..। এভাবেই একটার পর একটা ভাবনার স্রোত বইতে থাকে, মনের স্বাচ্ছন্দ চুরি হয়ে যায়। মনের মধ্যে চাপ আর চাঞ্চল্য তৈরি হয়। শরীরেও এর যথেষ্ট কুপ্রভাব পড়ে। যেকারণে মুক্তির আকাঙ্খায় আপনাকে চিঠি লিখতে হয়েছে। এই সীমাহীন চিন্তায় লাগাম পরাতে গেলে মস্তিষ্কের বিশেষ প্রশিক্ষণ দরকার হয়। প্রথমেই দরকার নিজের স্বয়ংক্রিয় নেতিবাচক চিন্তা নিজেই চিনে নেওয়া। খেয়াল রাখুন কখন কোন চিন্তা, কী-ধরনের চিন্তা,কী-বিষয়ের চিন্তা, এগুলো লিখে লিখে এক সপ্তাহের কেস ডাইরি রাখতে পারলে স্বয়ংক্রিয় নেতিবাচক চিন্তার চলাফেরাটা ধরে ফেলবেন। এটা হাতের মুঠোয় আসলেই শুরু হবে চিন্তা নিধন পালা । শুরুতেই ডিপ ব্রিদিংটা মাথায় রাখতেই হবে। মস্তিষ্কের মধ্যে দ্রুত অক্সিজেন প্রবাহ বাড়াতে মন ঠান্ডা রাখতে যার জুড়ি মেলা ভার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্রাহীন চিন্তা অতীতের কচকচানিতে মনকে ব্যস্ত করে তোলে এবং বর্তমানের মূল্যবান সময় আর শক্তি দুটোকেই জখম করে তোলে। ভালো হয় অতীত থেকে কী কী শিখলাম সেটাতে গুরুত্ব দেওয়া, ব্যর্থতাকে নয়। ব্যর্থতাতেও শিক্ষা থাকে। আরো ভালো হয় যদি কেবলমাত্র এখানে এবং এখন বৃত্তের মধ্যে চিন্তাটাকে আটকে রাখা যায় । হালকা ব্যায়াম এবং ৫ থেকে ১০ মিনিট দ্রুত একটা নির্দিষ্ট ছন্দে যদি ঘরের মধ্যেও পায়চারি করা যায় তাতেও চিন্তা আটকায়। কেননা শরীরে এন্ডরফিন নিঃসরণ হয়। ওটা সুখের হরমোন, চিন্তা তাড়াতে ওস্তাদ। এছাড়াও চিন্তা জানালার বাইরে দিকে তাকানো, ঠান্ডা জল খাওয়া এ সবই খানিকটা কাজে দেয়। চিন্তা এলেই নিজেকে সতর্ক করা এবং বর্তমান মুহূর্তে ফিরে আসা। চিন্তা অনেকটা সারমেয়র ল্যাজের মতো, যতই বর্তমানে ফিরি না কেন সুযোগ পেলেই আবার গুটিয়ে অতীতে চলে যেতে চাইবে। সেটাকে ঠেকানো জরুরি। এসবের পরেও যদি চিন্তা মস্তিষ্ক জবরদখল করে থাকে তাহলে মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সিলারের পেশাদারি সাহায্য নেওয়া দরকার। ❑

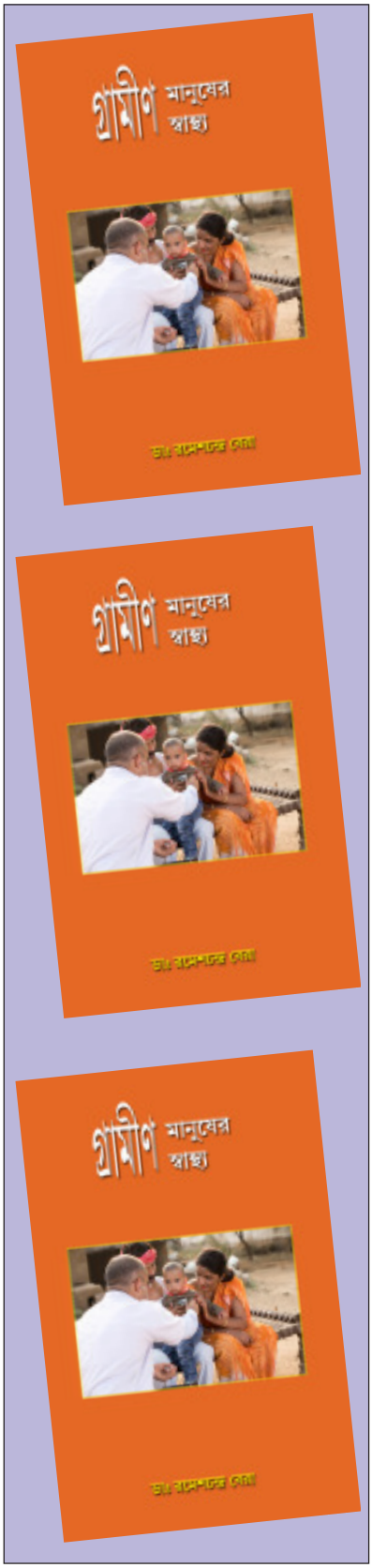

LIBBERTON™
ORTHOPEDIC CENTER

বাইপাসের ধারে বিশ্বমানের এবং আধুনিক অর্থোপেডিক সুপারস্পেশালাইজড হাসপাতাল

চিকিৎসা

- অস্টিওআর্থারাইটিস
- অস্টিওপোরোসিস
- হাড় ভাঙা, স্থানচ্যুতি
- জয়েন্টে ব্যথা, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস
- মেরুদণ্ডের ডিস্ক প্রোল্যাপস
- সায়াটিকার ব্যথা
- লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া
- হাড় এবং জয়েন্ট ইনফেকশন
- পূর্ববর্তী ব্যর্থ এবং জটিল অর্থোপেডিক সমস্যা

বিশেষত্ব

- সর্বনিম্ন সংক্রমণের হার
- সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসা, প্যাকেজ
- নগদহীন মেডিকেলেম সুবিধা
- দ্রুত আরোগ্য এবং সর্বোচ্চ রোগীর সন্তুষ্টি
- মডুলার অপারেশন থিয়েটার
- রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি
- মাইক্রোস্কোপিক মেরুদণ্ডের সার্জারি
- আর্থ্রোস্কোপিক লিগামেন্ট, মেনিস্কাস মেরামত

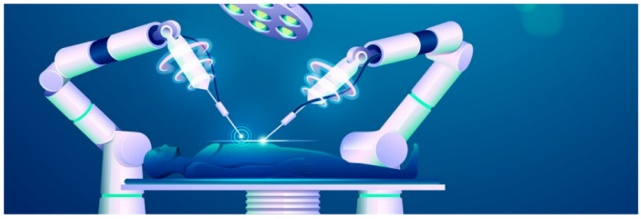

Libberton Orthopedic Center , 3rd Floor Avishar Shopping Complex, Avishikta Crossing, E.M.Bypass,Kolkata - 78

03348495025 / 03348495026 / 8420012671

কোর্সের সময়সীমা :

এক বছর (১২ মাস, পূর্ণসময়, থিয়োরি ও প্র্যাক্টিকাল এর সমন্বয়)

কোর্স ফিজ : ৬০,০০০ টাকা মাত্র।

বয়স : নূন্যতম আঠারো, কোনো উর্দ্ধসীমা নেই।

কোর্সে ভর্তি হবার নিয়ম :

এনরোল মেন্ট ফর্মটি ভরে উল্লিখিত মেইল আইডি তে পাঠিয়ে দিন। সাবজেক্ট এ Post Graduate Diploma Application উল্লেখ করে দিন।

মেইল আইডি : nabajatakcdcedu@gmail.com

ফোন নাম্বার : +91 98747 97340

সিলেকশন এর প্রক্রিয়া (Selection Procedure)

ক্যান্ডিডেট এর একটি অনলাইন এডমিশন টেস্ট (এম সি কিউ ভিত্তিক) এবং একটি পার্সোনাল ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। ফাইনাল রেজাল্ট যা সম্পূর্ণভাবে Performance Based, জানিয়ে দেওয়া হবে কিছুদিনের মধ্যে।

Admissions Open / Contact Us

+91 98747 97340
nabajatakcdcedu@gmail.com
www.nabajatakcdc.com

ডিপ্লোমার উদ্দেশ্য :

কোর্স শেষে শিক্ষার্থীরা শিখবেন :

- বিভিন্ন নিউরোডেভেলপমেন্টাল অবস্থার মূল্যায়ন ও নির্ণয় করা।
- বিশ্বব্যাপী সর্বজনীনভাবে প্রশংসিত আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।
- একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি সেটআপে কিভাবে সঠিক পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করবেন।
- পূর্ব ভারতের সবচেয়ে আধুনিক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ও সংযুক্ত ক্লিনিকাল সেট-আপগুলির মাধ্যমে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান্যতা প্রাপ্ত চিকিৎসক, থেরাপিষ্ট, সাইকোলজিষ্ট এবং স্বাস্থ্যসেবার সাথে যুক্ত থাকা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় জ্ঞান অর্জন করবেন।
- স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতামূলক গবেষণা করার সুযোগ।
- বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে শিশুদের পরিবারের সাথে সহযোগিতায় সামাজিক, মানসিক, উন্নয়নমূলক,আচরণগত স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন এবং প্রচার করতে সক্ষম হবেন।
- কমিউনিটি পেডিয়াট্রিক্স এবং জেরিয়াট্রিক্সের বুনিয়াদি শিক্ষা।
- শিশুর আচরণগত ও শারীরিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এর প্রতিরোধ, প্র্যাক্টিকাল অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাথমিক নীতিগুলি সম্বন্ধে জানবেন।
- শিশু স্বাস্থ্যের জন্য সঠিক পরিবেশ ও পুষ্টির বিজ্ঞানসম্মত সম্প্রচার করা।
- সব বয়সের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রকৃত অর্থে মূল্যায়ন করার জন্য প্রয়োগকৃত দক্ষতা অর্জন করা।

আমাদের ছাত্রদের জন্য চাকরির সম্ভাবনা :

একটি শিশু বা নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার যুক্ত শিশু বা ব্যক্তির বিকাশের সাথে জড়িত যে কোনো কাজের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ মূল্য সংযোজন করার জন্য যে প্রয়োগমূলক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা এই কোর্সের দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

- হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ইউনিট।
- পেডিয়াট্রিক ক্লিনিক।
- অটিজম, অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার (ADHD), সেরিব্রাল পালসি (CP), বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা, শিক্ষাগত অক্ষমতা, শিক্ষাগত অসুবিধা যেমন ডিসলেক্সিয়া, ডিসপ্র্যাক্সিয়া, ভিজ্যুয়াল বা ফোনিকস সংক্রান্ত অসুবিধা ইত্যাদির সাথে কাজ করা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি।
- গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
- জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র: একত্রিত শিশু ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (ICDS) কেন্দ্র এবং জেলা প্রাথমিক হস্তক্ষেপ কেন্দ্র (DEICs)।
- পুনর্বাসন কেন্দ্র; মাল্টিডিসিপ্লিনারি ক্লিনিক।
- জন্য পরিষেবা কেন্দ্র - দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসি এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী।
- ছাত্র কাউন্সেলর (প্রি-স্কুল, শিশু, বয়ঃসন্ধিকাল)।

অটিজমের একটি কার্যকরী চিকিৎসা আছে

ADMISSIONS OPEN
CONTACT US

BC-98, Salt Lake City, Sector-I Kolkata-700064
REGD OFFICE: #2 Golf Enclave, 14/149 Uday Sankar Sarani, kolkata - 700033

CONTACT US

+91 98747 97340
nabajatakcdcedu@gmail.com
www.nabajatakcdc.com

Clinical Communication
03335900929 (Tel),
9051294447 (Mob)

নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার

পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিপ্লোমা ইন আর্লি ইন্টারভেনশনে ফর নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার।
ইন কোলাবোরেশান উইথ সেন্টার ফর কোলাবোরেটিভ প্রোগ্রাম ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ। **(CCPTR)**
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজি।
(MAKAUT, পূর্বে WBUT)

ধন্বন্তরি

Dhanwantary Pharmacy

FIRST AID BOX

আপনার বাড়িতে, আছে তো ?

“

এইবার পেয়ে গেছি—আমার পরিবারের সুরক্ষার কবচ।
আপনিও অবশ্যই রাখুন একটি
First Aid Kit.
এটা শুধু ওষুধের বাক্স নয়,
ভালোবাসা ও যত্নের প্রতীক।

”

ধন্বন্তরি
40th
Dhanwantary
Anniversary
serving since 1984

*Conditions Apply

We Welcome Pranam Card Members

Introductory Offer - ~~899/-~~ 499/- only

Order for Free Home Delivery @ 98300 48880

SERUM
One of the largest chain Lab in India
25 in caring
Every Pathology
TEST RESULT IS IMPORTANT BECAUSE IT'S INVOLVE YOUR LIFE
micro biology lab medicine serology
reliability
pathology imaging cardiology neurology
SERUM ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
Regd. Office : 82/4B, Bidhan Sarani, Kol-4
62895 32188, 98302 74990
NABL ISO Asia One CGHS
SHYAMBAZAR 98300 66529
GARIAHAT 82405 63951
SALTLAKE 90079 21464
HOWRAH 98301 64836
SILIGURI 98009 56000
ASANSOL 98300 16593
MALDA 90513 99552
NEWTOWN 90513 99558
Regional Centres : Agartala | Allahabad | Bhubaneswar | Cuttack | Gangtok | Guwahati | Itanagar
Jabalpur | Jamshedpur | Patna | Port Blair | Ranchi | Raipur | Shillong | Varanasi | Kathmandu
www.sserumanalysiscentre.com | Follow us at :
Toll Free No. : 18001202014
bindumedia.co.in